আশ্বিন ১৩৮৪

# আনন্দমেলা

পুজো-সংখ্যা

এই সংখ্যা থেকেই টারজান আবার শুরু হল

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

## একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

দেশের ৮০ ভাগ লোক গ্রামে থাকেন। এঁদের টাকা নেই, জাতীয়করণের পর ব্যাঙ্ক এঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে- যাতে এঁরা স্বনির্ভর হতে পারেন।

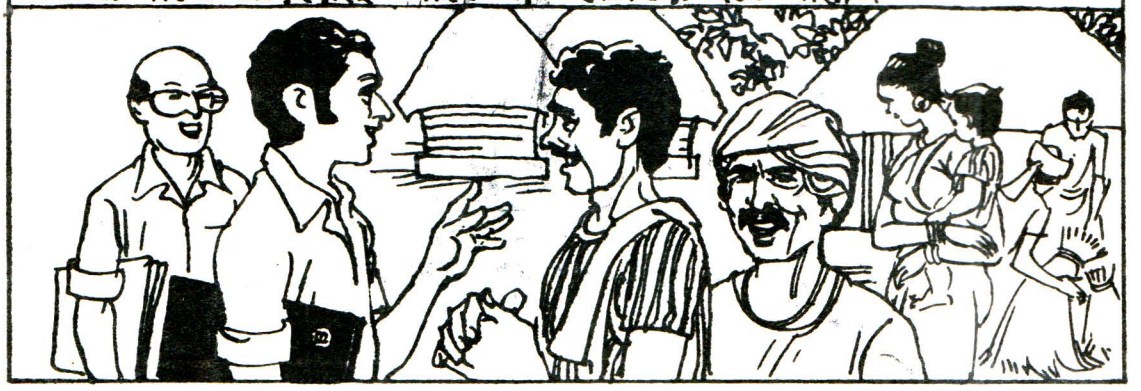

মন্টু বাপি মনে রেখো ইউকোব্যাঙ্ক ছোট-বড়, গরীব-বড়লোক সকলেরই জন্য – সকলেরই সাহায্যে ইউকোব্যাঙ্ক

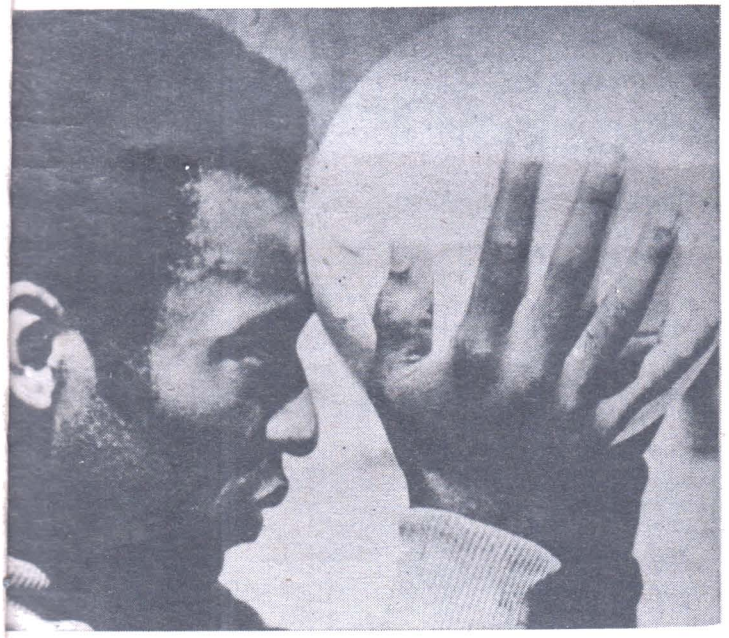

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৯ (১৬) টি-বি-সি ; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭

# আনন্দমেলা

আশ্বিন ১৩৮৪ সেপটেমবর ১৯৭৭ তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা
দেড় টাকা

# পেলে-সংখ্যা


| | |
|---|---|
| বিশেষ রচনা | পেলে । প্রেমেন্দ্র মিত্র ৫<br>যাঁদের নিয়ে কসমস । মুকুল দত্ত ৭<br>কসমস-এ কে কোথায় । পারিজাত ১০<br>ব্রাজিলে দুঃখের দিন । শ্যামসুন্দর ঘোষ ১২<br>পেলের হাজার । বসুসেন ১৪<br>মানুষ পেলের কথা । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ১৬<br>পেলে, সতেরো বছর বয়সে । চিরঞ্জীব ১৮ |
| গল্প | ওকিল সাহেবের নিমক । শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ৪২ |
| উপন্যাস | বন্ধ ঘরের আওয়াজ । সমরেশ বসু ৩৭<br>অলৌকিক । বিমল কর ৪৫ |
| বাঘের খবর | বাঘ বন্দী । সুরজিৎ দাশগুপ্ত ২১ |
| কমিক্স | টারজান ২৫, টিনটিন ৩০, ভুতুড়ে গাড়ি ১৯, নোলেদা ৫৩ |
| খেলাধুলো | উঠতি খেলোয়াড়দের কথা । পুষ্পেন সরকার ৫০ |
| ধাঁধা-মজা-রহস্য | আটখানা ২৮, ধাঁধা ২৮, কিসের ফটো ২৯, কিসের ছবি ২৯<br>শব্দ-সন্ধান ২৯ |
| ছবির পাতা | কসমসের রঙিন ছবি ৪, কসমসের অন্যান্য ছবি ৩২-৩৩ |
| অন্যান্য লেখা | মজার পড়া । কুন্তক ২৪ ॥ তোমাদের পাতা ৩৬<br>কিম্বাবিচিত্রা । দিদিমণি ৪৮ ॥ ডোডো-তাতাই । তারাপদ রায় ৪৯<br>মণিমেলার খবর ৪৯ ॥ আচ্ছা বলো তো । ভানুমতী ৫২ |

**সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত ।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

ওই একই খেলায় রয় এলান (১৫) হেড করে বলটিকে চিনাগ্লিয়ার (৯) কাছ থেকে হটিয়ে দিচ্ছেন।




নর্থ আমেরিকান সকার লীগে নিউ ইয়র্ক কসমস বনাম ওয়াশিংটন ডিপ্লোম্যাটস-এর খেলার একটি দৃশ্য। বাঁয়ে ডেরিক জেফারসন, মাঝখানে জিওর্জিও চিনাগ্লিয়া, ডাইনে মাইক ডিলন।

# পেলে !

## প্রেমেন্দ্র মিত্র

পেলে ! পেলে ! পেলে !
সত্যি তবে এলে !
বরাতজোরে টিকিট একটা পেলে,
বিস্ফারিত চক্ষু দুটি মেলে
দেখব এবার দুনিয়া মাতাও
কী কেয়াবাত খেলে!

পেলে ! পেলে ! পেলে !
শাহানশাহ-ই-'সকার'-জাহান
ব্রেজিল-ব্রজের কালো মানিক ছেলে,
জীবন'ভর তো তামাম দেশে
বল পিটিয়ে এলে,
বলো দেখি সত্যি দিব্যি গেলে
খেলার নামে এমন বাউরা
খেই-নৃত্য ভক্ত কোথাও পেলে ?

পেলে ! পেলে ! পেলে !
তাই তো বলি, ব্রেজিল-ব্রজে
নাইবা ফিরে গেলে !
'অ্যামাজন' না থাকুক, আছে
ওই তো বড় গঙ্গা।
'রিও-দ্য-জানেরো' না হোক
কলকাতা নয় বনগাঁ।
মাথায় করে রাখবে তোমায়,
রাখবে বুকে তুলে,
এই মথুরায় ব্রজের কথা বেবাক যাবে ভুলে !
একটি শুধু দায় !
ইস্ট-মোহন কার 'জার্সি'
চড়াবে ওই গায় ?

# তোমাদের মনের মতো রঙীন পূজাবার্ষিকী

# আনন্দমেলা

**বিশেষ আকর্ষণ**

শিল্পাচার্য নন্দলালের 'হেলা ফেলার কাজ'
'রবীন্দ্রনাথের এক কবিতার দুই রূপ'

**কবিতা**

অন্নদাশঙ্কর রায়, অজিত দত্ত ও আরও অনেকে

**ভ্রমণ কাহিনী**

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

**কীভাবে আবৃত্তি করতে হয়**—লিখেছেন
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র / দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

**পরীক্ষার্থীদের জন্য**

'কী করে নম্বর বাড়াতে হয়'
'পর্ষৎ কী রকম উত্তর চায়'

**ওয়ালট ডিজনির পুরো একটি**
**'ছবিতে কাহিনী'**

আর একটি কমিকস : 'নলেদার কাণ্ডকারখানা'

**খেলার কথা**

অমল দত্ত আর পি কে লিখেছেন
'কী ভাবে কোচিং করি'

এছাড়া আরও লেখা, ধাঁধা, ছবি ও
অনেক অনেক মজা

**সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হচ্ছে**

১২.০০/রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪.২০

তোমাদের কপির জন্যে আজই এজেন্টকে বলে রাখো বা
আমাদের লেখো :
সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড
কলকাতা-৭০০ ০০১

**উপন্যাস**

**আশাপূর্ণা দেবী**
**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়**
**শৈলেন ঘোষ**
**শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়**
**শেখর বসু**
এবং
**সত্যজিৎ রায়ের**
রচনা

**বড় গল্প**

বিমল মিত্র / শংকর

**গল্প**

প্রেমেন্দ্র মিত্র / সুবোধ ঘোষ / লীলা মজুমদার
মনোজ বসু / সমরেশ বসু / বিমল কর
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় / বুদ্ধদেব গুহ
দিব্যেন্দু পালিত
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও আরও অনেকে

AAM/CAS-12/77 BEN

# যাঁদের নিয়ে কসমস

## মুকুল দত্ত

'আনন্দমেলা' তো পাঠকদের হাতে পৌঁছয় মাসে একবার। কারণ এটি মাসিক পত্রিকা। মাসের লেখাও শেষ করতে হয় অনেক আগে। তাই শ্রাবণ সংখ্যায় যে আশঙ্কা করেছিলাম সে আশঙ্কা এখনো রয়েছে। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়েই বসে আছি। বারবার ভাবছি সেপ্টেম্বর মাসে মোহনবাগানের সঙ্গে খেলার জন্য আমেরিকার কসমস ক্লাব আসবে তো? কিংবা কসমস এলেও তার সঙ্গে আসবেন তো ফুটবলের দুই রাজা পেলে ও বেকেনবাউয়ার? তা ছাড়াও আছেন চিনাগ্লিয়া, স্ট্রাইকার হিসাবে যিনি দুর্বার। সারা পৃথিবীর মানুষ যাঁদের খেলা দেখার জন্য পাগল, আমরা তাঁদের খেলা দেখতে, কিংবা অন্তত তাঁদের চোখে দেখতে পাব তো?

আমার নিজের ধারণা, কসমস এলে তাদের সঙ্গে বেকেনবাউয়ার আসবেনই। কারণ বিশ্বকাপ জয়ী পশ্চিম জার্মান দলের অধিনায়ক ফ্রানৎস বেকেনবাউয়ার এ-বছরই কসমস ক্লাবে যোগ দিয়েছেন। পেলে খেলছেন তিন বছর ধরে। কসমসের সঙ্গে পেলের চুক্তি এবারেই শেষ হচ্ছে শরৎকালে। ওদের কলকাতায় আসার কথা সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। তার আগেই কি পেলে কসমস ছেড়ে যাবেন? মনে হয় না। পেলের জন্যই তো কসমসের আসার কথা শুনে এত মাতামাতি, খেলা দেখার একখানা টিকিট পাবার জন্য এত হাহাকার। কসমস এখনো যে-দেশে খেলতে যাচ্ছে সেখানে বড় বড় পোস্টার পড়ছে। তাতে লেখা থাকছে: "এই শেষ সুযোগ। ফুটবল-সম্রাট পেলে—ফুটবলের প্রবাদ পেলের খেলা দেখার এই শেষ সুযোগ। এর পরই পেলে ফুটবল থেকে বিদায় নেবেন।"

সত্যি কথাই। কসমস থেকে ছাড়া পেয়ে পেলে বোধহয় আর ফুটবল খেলবেন না। ফুটবলের শিক্ষামূলক ফিল্ম তিনি অনেক আগেই তৈরি করেছেন। নাম—'দি মাস্টার অ্যান্ড হিজ মেথড'। আন্তর্জাতিক যুব ফুটবলের উন্নতির ও প্রসারের এক পরিকল্পনা আছে পেপসি কোলা কোম্পানির। এর পর হয়তো শুরু হবে পেলে-পেপ্‌সির যৌথ উদ্যোগে ফুটবলের শিক্ষামূলক বিশ্ব পরিক্রমা।

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় পেলে অবশ্য এখন আগের মত খেলতে পারছেন না। বয়স তো ৩৬ বছর। তাছাড়া ফুটবল একজনের খেলা নয়—এগারোজনের একটি দলের খেলা। কসমসের বাকি খেলোয়াড়দের সঙ্গে ক্রীড়া বিন্যাসে থাপ খাওয়াতে অসুবিধা হচ্ছে। তবু পেলে হচ্ছেন পেলে। ফুটবলের ভগবান। যখন পেলে উঠতি খেলোয়াড়, খেলায় দারুণ চমক, তখন ইংলণ্ডের ফুটবল বিশেষজ্ঞরা ও'র খেলার ফিল্ম তুলেছিলেন, কায়দা-কানুনগুলো ভাল করে জানার জন্য। ফিল্ম দেখে বিশেষজ্ঞরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন, এ কী! শুধু-শুধুই হাজার দুয়েক ফুট সেলুলয়েড বাজে খরচ হয়ে গেল। কারণ ফিল্মে দেখা গেল পেলে একভাবে দুটি শট করেননি, একই প্রথায় দুজনকে কাটাননি, এক ধরনের শটে দুটি গোল করেননি। দুটি মুভমেণ্টের মধ্যে অনেক পার্থক্য, দুটি পাস দু ধরনের। একই ম্যাচে একই পেলের নানা রকমের কলাকৌশল—ফুটবল-শিল্পের রূপ রস এবং বৈচিত্র্য। তাই ফুটবল-পণ্ডিতরা রায় দিলেন, পেলে অননুকরণীয়। ও'কে অনুকরণ করতে যাওয়া হবে বোকামি।

তবু পেলেও তো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। সবদিন এবং সব সময় হয়তো সমান খেলতে পারেননি। যেমন ১৯৭০-এর বিশ্ব-

ফুটবলের রাজা পেলে

বেকেনবাউয়ার। বেস্ট ফুটবলার অব ইউরোপ

কাপের খেলা শুরুর আগে পেলের ফর্ম খুব ভাল ছিল না। ব্রাজিলের কোচ সালদানা পেলের বদলে খেলাতে চেয়েছিলেন টোস্টাওকে—যাঁকে বলা হত হোয়াইট পেলে। ব্রাজিলের মানুষ গর্জে উঠল। বলল, ফুটবলের ভগবানকেই বাদ? ফলে সালদানার চাকরি গেল। নতুন কোচ জাগোলা পেলেকে বিশ্বকাপে খেলালেন এবং ব্রাজিল তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জিতে বরাবরের জন্য সোনার পরীটি নিয়ে নিল। খেলায়, নিজের চতুর্থ বিশ্বকাপের খেলায়, পেলে দেখালেন তাঁর জাদুকরী পরিণত প্রতিভা।

এর কিছু আগে বোগোটায় এক আন্তর্জাতিক খেলায় কলম্বিয়ার রেফারি গিলারমো ভেলাসকোয়েজ পাঁচ মিনিটের সময় পেলেকে মাঠ থেকে বের করে দিলেন ফাউলের অপরাধে। তখন বোগোটার মানুষ রেফারিকে হাতে পেলে ছিঁড়ে ফেলে এই অবস্থা। দাঙ্গা বাধার উপক্রম। অবস্থা দেখে ব্যবস্থাপকরা পেলেকে মাঠে ফিরিয়ে আনলেন। রেফারিকে বাতিল করে খেলা পরিচালনার ভার দিলেন লাইনসম্যানের উপর। বেচারা রেফারি পালিয়ে বাঁচলেন। টানেলের পাশে লুকিয়ে পেলের খেলা দেখলেন মুখ উঁচু করে।

এই হচ্ছেন পেলে। তাঁকে নিয়ে লেখার, তাঁর খেলার কথা বর্ণনা করার এবং তাঁকে নিয়ে খেলা-পাগলদের নাচানাচি মাতামাতি করার ঘটনার কি শেষ আছে! টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো লিখলেও মস্ত এক বই হয়ে দাঁড়াবে।

১৯৫৮ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে সুইডেনের বিরুদ্ধে পেলের প্রথম গোলটির বর্ণনা করা যাক।

"বন্যপশুর মত চকিত ক্ষিপ্রতায় দেহের চমৎকার ভারসাম্য রেখে পেলে সার্কাস-তারকার মত বলটি থামালেন ডান উরুর কোমল পেশী দিয়ে, তারপর আলতো টোকায় বলটি তুললেন মাথার উপরে। হেড করে বলটি নামানোর মুখে এমনভাবে দেহ ঘোরালেন, যেভাবে ঘূর্ণমান চেয়ারে বসে মানুষ ঘুরপাক খায়। বল নামার মুখে নিখুঁত সময়জ্ঞানে রকেটের মত ভলি মারলেন, আর সুইডিশ গোলকীপার স্বেনসনের আঙুল ছুঁয়ে বল জড়িয়ে গেল গোলের জালে।"

এমন একটি গোল দেখা খেলা-প্রিয় মানুষের কাছে দিব্য দর্শনের মত।

১৯৬৪ সালে রিও-ডি-জেনেরিওর মারাকানা স্টেডিয়ামে দু'লাখ দর্শকের সামনে যেদিন ব্রাজিল ৫—১ গোলে ইংলন্ডকে হারিয়েছিল সেদিন সাংবাদিক পিটার লরেঞ্জো লিখেছিলেন—"ডেনিস ল, ফেরেঙ্ক পুসকাস, ডি'স্টিফানো, জিমি গ্রিভস, হিদেকুটি প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়দের গুণের সমন্বয়ে সৃষ্ট একজন খেলোয়াড়ের নাম—এডসন অ্যারান্টেস ডো নাসিমেন্টো। অর্থাৎ পেলে। চার শব্দের ওটি ওঁর পোশাকি নাম।

১৯৬৬-র বিশ্বকাপ ফাইনাল পর্যায়ে পেলেকে একরকম খেলতেই দেওয়া হয়নি। বল ধরা মাত্র চারদিক থেকে সবুট পা এগিয়ে এসেছে। বুটের আঘাতে পেলের পায়ের মাংস উঠে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। ওই আসরে ক্রীড়াদক্ষতায় অনেকে পর্তুগালের ইউসেবিওকে স্থান দিয়েছিলেন পেলের উপরে। ইউসেবিওই প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, "পেলে হচ্ছেন ফুটবলের বাদশা, আমি গোলাম। ফুটবল সাম্রাজ্যের সম্রাটের সঙ্গে কারো তুলনা চলে না।"

ফুটবল খেলে কত অর্থ উপার্জন করেছেন পেলে? রাশি রাশি অর্থ। ব্রাজিলের যে ক্লাবে খেলতেন সেই স্যান্টোস ক্লাব বছরে মাইনে দিত ১৬ লাখ টাকা। এছাড়া ফুটবলের দৌলতে আয় করেছেন অঢেল অর্থ। উপঢৌকন ও পুরস্কার পেয়েছেন কাঁড়ি-কাঁড়ি। লন্ডনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রদর্শনীতে পেলের কিছু স্মারক পাঠানো হয়েছিল ৭০-এর বিশ্বকাপের পর। খোয়া যাবার ভয়ে লয়েড কোম্পানিতে ওই সব স্মারকের জন্য যে বিমা করা হয়েছিল তার হিসাব নিম্নরূপঃ

যে জার্সিটি গায়ে দিয়ে সহস্রতম গোলটি করেছিলেন—৩০ হাজার ডলার। যে হাফপ্যান্ট পরে বিশ্বকাপে খেলেছেন—৩০ হাজার ডলার। যে বলটিতে হাজার গোল পূর্ণ হয়—৬০ হাজার ডলার। ১৯৫৮ সনে যে বুট পরে বিশ্বকাপে খেলেছিলেন—৬ হাজার ডলার।

ওই প্রদর্শনীতে কিন্তু ফুটবলের রাজা সেই মুকুটটি পাঠাননি, যে মুকুট তাঁর দেশবাসী আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায়বেলায় উপহার দিয়েছেন। কিংবা পাঠাননি চার পাউন্ড নিখাদ সোনার তৈরি বলটি, যা তিনি হাজার গোল করার পর পেয়েছিলেন।

বেকেনবাউয়ার কতবড় প্লেয়ার? প্রায় পেলেরই মত। ভাবমূর্তিতে পেলে অবশ্যই বড়, কিন্তু এখন ক্রীড়াদ্যুতি বোধহয় বেকেনবাউয়ারেরই বেশি। ক্রীড়াক্ষমতা এবং দক্ষতায় তিনি এখনও পুরোপুরি দীপ্যমান। বয়সেও তো পেলের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট।

পেলের মত বোধহয় বেকেনবাউয়ারও চারবার বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায় খেলবেন। আট বছরে তিনবার খেলেছেন। ১৯৭৮-এ আর্জেন্টিনায় হবে একাদশ বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ের খেলা। বেকেনবাউয়ারের অধিনায়কত্বেই ৭৪-এর বিশ্বকাপ জিতেছে পশ্চিম জার্মানি। বেয়ার্ন-মিউনিখ দল ছেড়ে কসমস ক্লাবে চলে যাওয়ায় জার্মানি যদি অভিমান করে বেকেনবাউয়ারকে আর্জেন্টিনায় না খেলায়, তো পৃথক কথা। তাতে ক্ষতি হবে জার্মানিরই। বিশ্ব ফুটবলে পশ্চিম জার্মানির প্রতিষ্ঠার মূলে এই খেলোয়াড়টির অবদান অনেকখানি, আন্তর্জাতিক ফুটবলেও তাঁর অনেক কীর্তি। কোনো সম্মান পেতেই বাকি নেই। কিশোরকালে যুব ফুটবলে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন। দুবার পেয়েছেন "বেস্ট ফুটবলার অব ইউরোপ" খেতাব। তাঁর অধিনায়কত্বে তাঁর দল বেয়ার্ন-মিউনিখ বহুবার জার্মানির লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, পেয়েছে কাপ উইনার্স কাপ। বিশ্বকাপ জয়ের কথা তো আগেই বলেছি। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিকদের ভোটে পেলের সঙ্গেই স্থান পেয়েছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একাদশ দলে।

পাঁচ ফুট সওয়া এগারো ইঞ্চি মাথায় উঁচু এই অসাধারণ খেলোয়াড় ১৯৬৬ সালে বিশ্ব কাপের খেলার পর যখন ইংলন্ডের রানীর হাত থেকে রানার্সের পুরস্কার নিচ্ছিলেন তখন দর্শকদের কী হাততালি ও উল্লাস। সমস্বরে ধ্বনি উঠল—'আউটস্ট্যান্ডিং ডিফেন্ডার অব দা টুর্নামেন্ট'। অর্থাৎ সারা প্রতিযোগিতায় রক্ষণভাগের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।

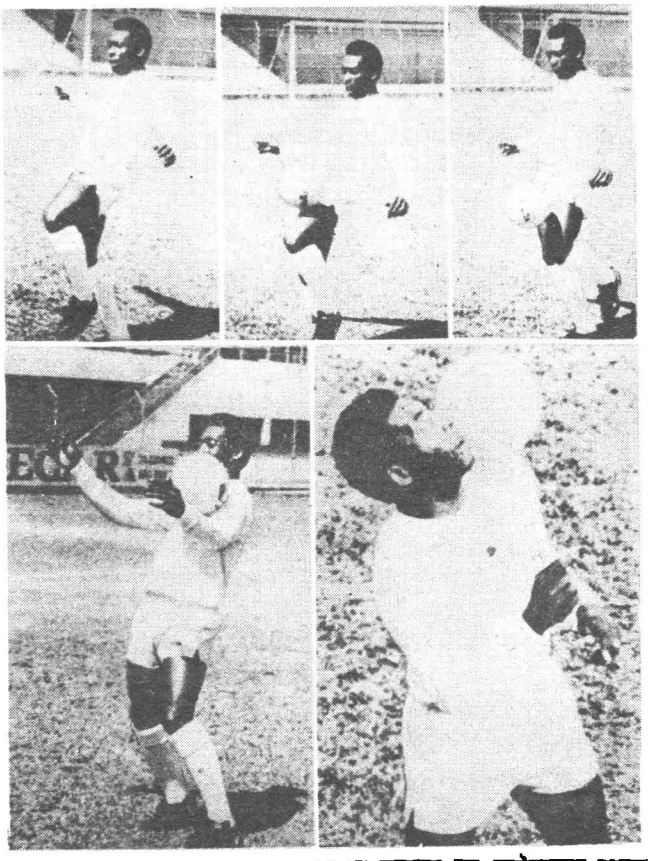

হরেক কায়দায় বল আটকাচ্ছেন পেলে

চারবছর পরে মেক্সিকোয় বিশ্বকাপের খেলায় চমকের পর চমক সৃষ্টি করেছিলেন। বিশেষ করে দারুণ খেলেছিলেন কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমি ফাইনালে। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংলণ্ড গোল করে এগিয়ে যাবার পর বেকেনবাউয়ার হয়ে উঠেছিলেন অপ্রতিরোধ্য। ও'রই গোলার মত শটে গোল শোধ হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানি জিতেছিল ৩—২ গোলে। সারা খেলায় ছিল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। তার চেয়েও পশ্চিম জার্মানি বনাম ইতালি সেমিফাইনাল ম্যাচ হয়েছিল বেশি উত্তেজনাপূর্ণ। বলা হয়েছিল ৭০-এর বিশ্বকাপের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ। ৩—৪ গোলে জার্মানি হেরে গিয়েছিল। শেষ চমক দেখিয়েছিলেন ফ্রানৎস বেকেনবাউয়ার, ডান হাতখানা ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও জখম হাতে স্লিং বেঁধে শেষ পর্যন্ত সারা মাঠে সিংহ বিক্রমে লড়াই করে।

আরও চার বছর পরে, অর্থাৎ ৭৪-এর বিশ্বকাপে তো সবাই ধরে নিয়েছিল হল্যাণ্ডই ফাইনালে জিতবে। প্রথম মিনিটে পেনাল্টি কিক থেকে একটি গোল করে হল্যাণ্ড এগিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু অধিনায়ক বেকেনবাউয়ারের ধীরস্থির পরিকল্পনা এবং রাজসিক ক্রীড়াশৈলী সব ভেস্তে দিল। পশ্চিম-জার্মানি জিতল ২—১ গোলে। জার্মানির কাছে বেকেনবাউয়ার হয়ে উঠলেন কাইজার, ব্রাজিলবাসীর কাছে পেলে যেমন রাজা।

ফুটবল খেলে অর্থ উপার্জনেও পেলের পরই বেকেনবাউয়ার। বছরে আয় করতেন আধ কোটি টাকা। তিন বছরে দু কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার চুক্তিতে গিয়েছেন কসমসে।

*

পেলে ও বেকেনবাউয়ার ছাড়া কসমসের আর খেলোয়াড় কারা? যুগোস্লাভিয়ার ভিটোমির ডিমেট্রিজেভিক, জাডরান্কো টপিক, কানাডার ব্রুস টোয়ামলি, তুরস্কের এরল ইয়াসিন, পেরুর র‍্যামন মিফিন, ইতালির চিনাগ্লিয়া, ইংলণ্ডের স্টেভ হাণ্ট, কিথ এডি, মাইক ডিলন, টমি ফিল্ড, টেরি গরবেট, চার্লি আইটকেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের শেফ মেসিং, বব স্মিথ, ওয়ের্নার রথ প্রভৃতি পৃথিবীর বহু নামী খেলোয়াড়।

ফুটবলে দক্ষিণ আমেরিকা দারুণ সমৃদ্ধ। উত্তর আমেরিকা সবে সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে, যদিও ১৯৫০-এর বিশ্বকাপে একবার ইংলণ্ডকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল আমেরিকার কাছে। ঘটনাটা তখন ছিল কাশীতে ভূমিকম্পের মত। যাই হোক উত্তর আমেরিকার ফুটবল লীগের বয়স মাত্র ১১ বছর। নাম নর্থ আমেরিকা সকার লীগ (এন এ এস এল)। কসমস ক্লাবের বয়স বেশি নয়। সৃষ্টি ১৯৭১ সালে। আগে নাম ছিল নিউইয়র্ক কসমস ক্লাব। এখন ক্লাবটির আস্তানা নিউজার্সিতে। তাই নামের আগে থেকে নিউইয়র্ক কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

অঢেল ডলারের দেশ আমেরিকা। কসমসের প্রেসিডেন্ট ক্লাইভ টোয়ি এক ধনকুবের। প্রয়োজনে সোনা দিয়ে খেলোয়াড় গড়তে পারেন। কিন্তু তাদের মধ্যে তো প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। তাই সোনার দামে খেলোয়াড় কিনছেন পৃথিবীর ফুটবল-হাট থেকে। কোচ কিনেছেন ইংলণ্ড থেকে। নাম গর্ডন ব্র্যাডলে। কিন্তু দশ-বারোটি দেশের বিশ-বাইশজন খেলোয়াড়কে একটি সুসংবদ্ধ দলে দাঁড় করানো বেশ কঠিন কাজ। তাই শুধু ১৯৭২-এ ছাড়া কসমস কোনবার এন এ এস এল চ্যাম্পিয়ন হয়নি। তাছাড়া অন্য দলগুলিও তো কম শক্তিশালী নয়। গতবারের চ্যাম্পিয়ন টোরেণ্টো মেট্রো ক্রোসিয়া, টাম্পা বে রাউডিজ, কনেটিকাট বাইসেণ্টিনিয়াল, ফোর্ট লডারেল স্ট্রাইকার্স, ডালাস টোরাণ্ডো, লস অ্যাঞ্জেলিস আজটেকস, লাস ভেগাস প্রভৃতি দলেও তো পৃথিবীর সব ডাকসাঁইটে খেলোয়াড় রয়েছেন। ইউসেবিও আছেন লাস-ভেগাসে, ইংলণ্ডের গোলকিপার গর্ডন ব্যাঙ্কস আছেন ফোর্ট লডারেলে এবং জর্জ বেস্ট ও রন ডেভিস অ্যাঞ্জেলিসে। তবে চোখ-ধাঁধানো নাম কসমসেই বেশি।

# কসমস-এ কে কোথায়

পারিজাত

কসমস ক্লাব তো কলকাতায় এসে গেল বলে! খেলাটা আরও কিছু দিন পরে হলে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে বলা যেত : আশ্বিনের মাঝমাঝি/উঠিল বাজনা বাজি/খেলার সময় এল কাছে! বাজনাটা বাজছে অবশ্য আমাদের সকলের বুকের মধ্যে। আর খেলার দিন তো মাঠে সানাই, ব্যান্ড এসব বাজবেই!

সে কথা যাক। পেলে আর বেকেনবাউয়ারকে বাদ দিলে কসমস ক্লাবের ক'জনকে আমরা চিনি? ওঁদের দুজনের বিশেষ করে পেলের, যাবতীয় তথ্য এখন সকলের নখদর্পণে। পেলের জার্সির নম্বরটা যে ১০, তা কি আর কাউকে বলে দিতে হবে? আর বেকেনবাউয়ার-এরটা ৬, তাও এতদিনে অনেকে জেনে ফেলেছে। কিন্তু এঁদের দুজন ছাড়াও আরও যে ২৭ জন খেলোয়াড় কলকাতায় আসছেন, তাঁদের পরিচয় জানতে হবে না? যেমন, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, "কসমসের ক্যাপ্টেন কে? কোচই বা কে? দলের মধ্যে বয়েসে সবচেয়ে ছোট কে? আর সবচেয়ে বড়?" তাহলে?

আনন্দমেলা এ-সমস্ত খবর জোগাড় করেছে। সকলের আগে।

প্রথমে এক নজরে টিমটাকে দেখা যাক। মোট ৩৩ জনের দল আসছে।

পেলে বল নিয়ে এগোচ্ছেন

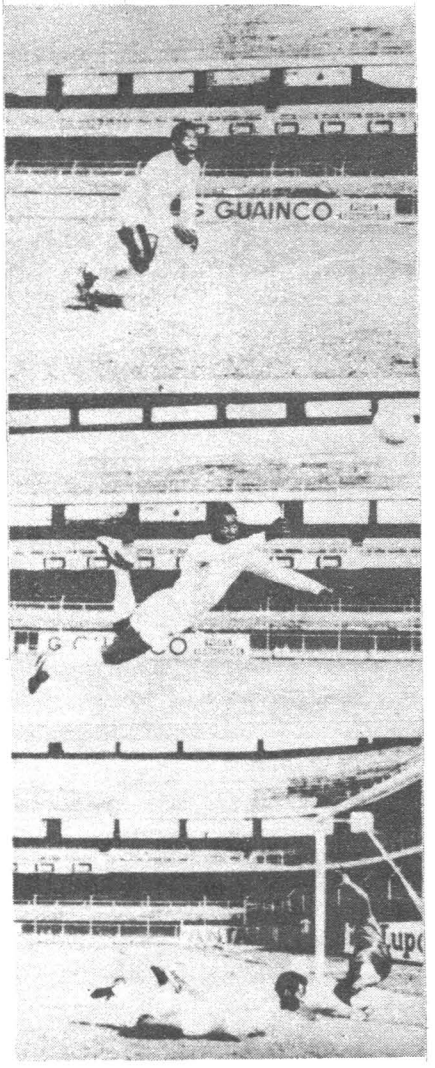


বল হেড করবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে পেলে

প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে হেড করেছেন

খেলোয়াড়রা ছাড়া আছেন ৩ জন কোচ ও একজন ট্রেনার। উনত্রিশজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৩ জন গোলকীপার, ৭ জন "ডিফেন্ডার", ৯ জন "মিডফিল্ডম্যান" আর ১০ জন ফরোয়ার্ড। (ও'রা এইভাবেই পজিশান জানিয়েছেন আপাতত।) অধিনায়ক ওয়েরনার রথ ডিপ ডিফেন্সে খেলেন। দলের সবচেয়ে কমবয়সী খেলোয়াড় স্টিভ হান্ট। গত মাসে বাইশে পা দিয়েছেন। অবশ্য দলে বাইশ বছরের আরো দুজন আছে। কিন্তু তাঁরা স্টিভের চেয়ে সামান্য বড়। আর, ৩৭ বছরের পেলে খেলার মত বয়েসেও দলের সকলের বড়দা। কসমস দলটির বয়েসের গড় ২৭ বছর ১ মাস ১৯·৫ দিন। দলের ৯ জন খেলোয়াড় খুবই লম্বা—ছ' জন ৬ ফুট আর তিন জন ৬ ফুট ১ ইঞ্চি। ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির নীচে কেউই নেই! উচ্চতার গড় ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। প্রধান কোচ এডি ফারমানি। তাঁর সাহায্যকারী দু'জন হলেন অধ্যাপক জুলিও মাজজি—পেলের কোচ—এবং জো ম্যালেট। ট্রেনারের নাম জেফ স্নীক।

"কসমস" কথাটির মানে "বিশ্বনিখিল" বা "মহাজগৎ"। সোজা কথায় বিশ্বপৃথিবী। সেদিক থেকে ক্লাবটির নাম সার্থক বটে। পৃথিবীর বহু দেশ থেকেই খেলোয়াড় এনে জড় করা হয়েছে এখানে। সবচেয়ে বেশি অবশ্য আমেরিকারই খেলোয়াড়—বারো জন। তারপর ইংল্যান্ড ও ব্রাজিল। দু'দেশ থেকেই চারজন আছেন। কানাডা ও যুগোস্লাভিয়া থেকে দুজন করে। পেরু, ইটালি, জার্মানি, তুরস্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একজন হিসেবে আরও পাঁচজন।

কসমসের খেলোয়াড়দের জার্সির নম্বর নিয়ে একটা বেশ মজার ধাঁধা তৈরি করা যায়। আগে থেকে না জানলে তার উত্তর দেওয়া যাবে না কিছুতেই। দলে খেলোয়াড় ২৯ জন কিন্তু জার্সির নম্বর ৩৪ পর্যন্ত। কী করে? ৫, ১৩, ১৬, ১৭, ২৪ ও ৩১ নম্বরের জার্সি কেউ পরেন না। তাতেও হিসাব মিলছে না? একজন গোলকীপার যে আবার শখ করে '০' নম্বর পরেন। এখন মিলেছে নিশ্চয়ই!

এবার পজিশান অনুযায়ী কসমস ক্লাবের খেলোয়াড়দের নাম, উচ্চতা, বয়স ইত্যাদি দেখা যাক। যাঁর নামের পর ব্র্যাকেটে দেশের নামের সঙ্গে যে নম্বর দেওয়া আছে, সেই নম্বরের জার্সি পরেই তিনি মাঠে নামবেন।

গোলের তিনজন হলেন—বিল ল্যাডকি (০, আমেরিকা), সেপ মেসিং. (১, আমেরিকা) আর এরল ('লেভ' নয় কিন্তু!) ইয়াসিন (১১, তুরস্ক)। প্রথম দু'জনেই ৬ ফুট লম্বা। ইয়াসিন আবার

আরও এক ইঞ্চি। হয়তো পদবীর গুণেই! এদের বয়েস যথাক্রমে ২৪, ২৮ আর ২৯ বছর।

ডিপ ডিফেণ্ডাররা—রবার্ট ইয়ারুসি (২, ক্যানাডা), অধিনায়ক ওয়েরনার রথ (৪, আমেরিকা), বব স্মিথ (১২, আমেরিকা), মাইক ডিলন (২০, ইংল্যাণ্ড), রিলডো (২৩ ব্রাজিল), কার্লো আলবার্টো (২৫, ব্রাজিল) এবং পল হাণ্টার (২৬, কানাডা)। অধিনায়ক রথের বয়েস ৩০ বছর। জন্ম ১৯৪৮ সালের ৪ এপ্রিল। আর ৩৪ বছর বয়েসী কার্লো আলবার্টো ছিলেন ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের অধিনায়ক। সেবার ফাইনালে ব্রাজিলের চতুর্থ এবং শেষ গোলটি আলবার্টোর পা থেকেই এসেছিল। ডিফেণ্ডারদের মধ্যে আর পাঁচজনেরই বয়েস তিরিশের নীচে। সবচেয়ে ছোট পল হাণ্টার ২২ বছর। ইয়ারুসির বয়েস আর এক বছর বেশি। ডিলন, রিলডো আর স্মিথের যথাক্রমে ২৫, ২৬ ও ২৭ বছর। উচ্চতার দিক থেকে হিসেব করলে প্রথমেই আসেন রথ, আলবার্টো এবং ইয়ারুসি। প্রত্যেকেই পাক্কা ছ' ফুট। পাঁচ-এগারোর দলে পড়ছেন স্মিথ, ডিলন ও হাণ্টার। রিলডোর উচ্চতা পাঁচ-নয়।

এবার মধ্যমাঠের তারকাদের দেখা যাক। ফ্রানজ বেকেনবাউয়ার (৬, পশ্চিম জার্মানি) ছাড়া বাকি আটজন হলেন—ডিটো দিমিত্রিজেভিক (৩, যুগোস্লাভিয়া), টেরি গর্বেট (৮, ইংল্যাণ্ড), নেলসি মোরে (১৪, ব্রাজিল), রেমন মিফলিন (১৫, পেরু), গ্রেগ কুর্তোসিস (২৭, আমেরিকা), টম ল্যাং (২৮, আমেরিকা), টিম কেভিল (৩২, আমেরিকা) এবং ক্রিস অ্যাগোলিয়াতি (৩৩, আমেরিকা)। ইউরোপের "ফুটবলার অব দি ইয়ার" বেকেনবাউয়ার এবং গর্বেটই ন'জনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। দুজনেরই বয়েস ৩৩ বছর। মিফলিনের ৩১ বছর। আর সবাই তিরিশের কম—দিমিত্রিজেভিকের ২৯, মোরে এবং অ্যাগোলিয়াতির ২৬। অপেক্ষাকৃত তরুণ কুর্তোসিস আর কেভিল দু'জনেরই ২৩ এবং এঁদের থেকেও এক বছরের ছোট ল্যাং। কুর্তোসিস কিন্তু মাঝমাঠের সবচেয়ে লম্বা খেলোয়াড়—ছ' ফুট। বেকেনবাউয়ার এক ইঞ্চির জন্যে তাঁর সমান হতে পারেননি! এরপর দিমিত্রিজেভিক আর কেভিল, দু'জনেই পাঁচফুট দশ। বাকি পাঁচজনই পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চির দলে।

ফরোয়ার্ডে পেলে ছাড়া যে ৯ জন তাঁদের নাম—টনি ফিল্ড (৭, ইংল্যাণ্ড), জিওর্জিও চিনাগ্লিয়া (৯, ইটালি), স্টিভ হাল্ট (১১, ইংল্যাণ্ড), জাদর‍্যাংকো টোপিক (১৮, যুগোস্লাভিয়া), গ্যারি ইথারিংটন (২১, আমেরিকা), যোমো সোনো (২২, দক্ষিণ আফ্রিকা), বব রর‍বাচ্ (২৯, আমেরিকা), স্কট ট্র্যাসবার্গ (৩০, আমেরিকা) এবং রোবার্টো ডি'অলিভেরা (৩৪, আমেরিকা)। পেলে আর হাণ্ট শুধু ফরোয়ার্ডদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে কম বয়েসের নন, গোটা দলের মধ্যেও—সে-কথা আগেই লিখেছি। মজার ব্যাপার হল, এ'দের দু'জনের জার্সির নম্বরও আবার পর পর। ফরোয়ার্ড লাইনে পেলে ছাড়া আর তিনজন আছেন, যাঁদের বয়েস তিরিশ বা তার বেশি। ফিল্ডের ৩২, চিনাগ্লিয়ার ৩১ এবং ইথারিংটনের ৩০। এর পরেই আসছেন টোপিক—২৯। বাকি রইলেন চারজন তরুণ ফরোয়ার্ড। প্রত্যেকেই তেইশ। দলের তিনজন 'ছফুট প্লাস' খেলোয়াড়দের মধ্যে ফরোয়ার্ডেই দু'জন : চিনাগ্লিয়া, রর‍ব্যাচ। টোপিক আর ট্র্যাসবার্গ পাঁচ-এগারো করে। পেলে, টম ল্যাং পাঁচ-নয়। বাকি চার জন পাঁচ-আট।

তাহলে কসমসের খেলোয়াড়দের মধ্যে সাদা-কালো, বয়স্ক-তরুণ, লম্বা-কমলম্বা, আমেরিকা ও বাইরের, সবরকমই আছেন দেখা যাচ্ছে! এখন শুধু তাঁদের মাঠে নামার অপেক্ষা।

বল আটকাবার আরও দুটি ভঙ্গি

হেড করবার আরও কয়েকটি ভঙ্গি

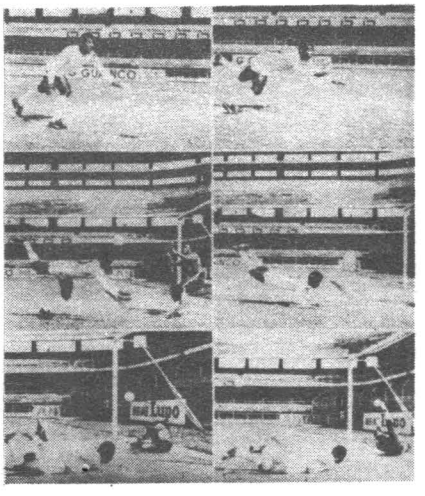

প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন

# ব্রাজিলে দুঃখের দিন

## শ্যামসুন্দর ঘোষ

১২ পেলে । বল নিয়ন্ত্রণের একটি ভঙ্গি

ফুটবলের ব্যাপারে এ রাজ্যের জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত নেই। সেই উৎসাহ উন্মাদনা তুঙ্গে ওঠে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে। কলকাতা ফুটবল লীগে এই দুই প্রধানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শুধু যে কলকাতার লোকই আলোড়িত হয় তা নয়, গ্রাম-গঞ্জেও এই খেলার ফলাফলকে নিয়ে চলে ক্রীড়া প্রেমিকদের মধ্যে আলোচনা। আর সেই আলোচনার রেশ চলে খেলা শেষ হওয়ার বেশ কিছুদিন পরেও।

এ বছর লীগে ইস্টবেঙ্গলের হাতে মোহনবাগানের পরাজয় মোহনবাগানের অনেক সমর্থকের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। কারণ গত বছর মোহনবাগানের লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার পথে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন সেই ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৯ জনই এ বছর দলে ছিলেন। সেই সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল থেকে এ বছর মোহনবাগান দলে এসেছেন চার বিখ্যাত খেলোয়াড়—বিশ্বজিৎ দাস, সুধীর কর্মকার, গৌতম সরকার ও শ্যাম থাপা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোহনাগানকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের কাছে। আর হার স্বীকারের পর মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে দীর্ঘদিন চলেছে সমর্থকদের বিক্ষোভ।

খেলায় পরাজয় দুঃখজনক। বিশেষ করে যেখানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে চির-প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কাছে। তবে কিনা ফুটবলকে ঘিরে দুটি দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্বের সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে দুটি দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুখ্যত লিভারপুল ও এভার্টনকে ঘিরে। আবার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মধ্যেও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছাপ সুস্পষ্ট। দুটি দলের সমর্থকদের মধ্যে নিজ-নিজ দলের সাফল্যকে ঘিরে উৎসাহের ঢেউ ইটালি, ব্রাজিল, উরুগুয়ে প্রত্যেক দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। ইটালিতে লীগ ফুটবলে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল হল এ সি মিলান ও ইনটারন্যাশন্যাল। ব্রাজিলের রিও লীগে ফ্লুমাইনেন্স ও ফ্লামেনগো। এই দুটি দলের সাক্ষাৎকারকে ঘিরে ব্রাজিলের ফুটবল অনুরাগীদের মধ্যে দেখা যায় দারুণ উৎসাহ। এই দুই দলের খেলায় মাঠে উপস্থিত লোকসংখ্যা হয় এক লক্ষেরও উপর।

এ পর্যন্ত মারকানা স্টেডিয়ামে এই দুই দলের খেলায় রেকর্ড সংখ্যক দর্শক উপস্থিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালে, ১,৭৭,৬৫৩। ১৯৬৯ সালে উপস্থিত দর্শকের সংখ্যা ১,৭১,৫৯৯।

উরুগুয়ের প্রধান দুটি দল হল পেনারল ও নেসিওনাল। উরুগুয়ের লীগ প্রতিযোগিতায় নেসিওনাল চ্যাম্পিয়নশিপ সাধারণত নির্ধারিত হয় এই দুই দলের খেলার ফলাফলের উপর। তাই দুটি দলেরই রয়েছে প্রচুর সমর্থক আর সেই সমর্থকেরা উপস্থিত হন মাঠে তাদের প্রিয় দলকে উৎসাহিত করতে।

মারকানা স্টেডিয়ামের কথা উঠলেই মনে পড়ে ব্রাজিল বনাম উরুগুয়ের ১৯৫০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের কথা। বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিলের পক্ষে সবচেয়ে বেদনাদায়ক পরাজয়-রূপে এই খেলাটি চিহ্নিত হয়ে আছে।

১৯৫০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের দিকে লক্ষ রেখেই ব্রাজিল সরকার মারকানা স্টেডিয়াম নির্মাণ করেন। ব্রাজিল-বাসীদের মনে আশা ছিল, নবনির্মিত এই স্টেডিয়ামেই উড়বে তাদের দেশের বিজয়-পতাকা। এই স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে তারা গ্রহণ করবে বিশ্ব ফুটবল-আসরে জয়ের স্বাদ। কিন্তু তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হল তাদেরই চিরশত্রু উরুগুয়ের কাছে। অথচ আগের খেলাগুলি দেখে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, ব্রাজিল উরুগুয়ের কাছে পরাজিত হবে। ফাইনাল পুলে চারটি দলের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রাজিল সুইডেনের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিল ৭—১ গোলে আর স্পেনকে হারিয়ে-

পেলে । খেলা করবার আগের মুহূর্তে

পেলে । বল নিয়ন্ত্রণের আরও তিনটি ভঙ্গি

পেলে । শট নেবার আগে বলটাকে থামাচ্ছেন

ছিল ৬—১ গোলে। পাশাপাশি উরুগুয়ে প্রথম খেলায় স্পেনের সঙ্গে প্রথমে পিছিয়ে থেকে ২—২ গোলে খেলা শেষ করে, আর সুইডেনের বিপক্ষে প্রথমার্ধে ১—২ গোলে পিছিয়ে থেকে ৩—২ গোলে জয়লাভ করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই খেলার শুরুতে ব্রাজিলবাসীরা আশা করেছিল তারা এ খেলায় জয়লাভ করবে। একে উরুগুয়ে দুর্বল দল, তার উপর এ-খেলায় ফলাফল যদি অমীমাংসিত থাকে, তাহলেও ব্রাজিল সর্বপ্রথম বিশ্বকাপ ঘরে তুলতে পারবে। আর সেই কাপ জয় করা হবে চিরশত্রু উরুগুয়ের কাছ থেকে। ব্রাজিল ও উরুগুয়ের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কও ভাল ছিল না।

১৬ই জুলাই নবনির্মিত মারকানা স্টেডিয়ামে এই খেলা দেখার জন্য দুলক্ষের বেশি দর্শক উপস্থিত ছিল। প্রথমার্ধে ব্রাজিল একতরফা আক্রমণ চালিয়েও কোনো গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্রাজিলের ফ্রিয়াকা গোল করে যখন দলকে এগিয়ে দিল, তখন মাঠে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। রংবেরঙের পতাকা এবং সেই সঙ্গে গ্যালারিতে দর্শকদের নৃত্য। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটে উরুগুয়ের স্কিয়াফিনো একটি গোল করে বসলেন। ভ্যারেলা ডানদিকে জিগিয়াকে বলটি বাড়িয়ে দিলেন আর জিগিয়ার পাস্ থেকে স্কিয়াফিনো সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় বলটি ধরে জালে ঠেলে দিলেন। তখনও ব্রাজিলবাসীদের মনে আশা, তারা বিশ্বকাপ জয় করতে পারবে। কিন্তু সমাপ্তির ১১ মিনিট আগে জিগিয়া উরুগুয়ের পক্ষে গোলটি করে দ্বিতীয়বার দেশকে বিশ্বকাপ ফুটবল জয়ে সাহায্য করে।

ব্রাজিলবাসীদের কাছে এই পরাজয় শুধু অকল্পনীয়ই ছিল না, ছিল অসহ্য। তাই ব্রাজিলের অনেক ঘরেই সেদিন পালিত হয়েছিল অরন্ধন। দেশ জুড়ে নেমেছিল শোকের ছায়া। মনে হয়েছিল যেন তাদের কোনো জাতীয় নেতার মৃত্যু ঘটেছে। আর তা হবেই বা না কেন? ফুটবল তাদের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, ফুটবল তাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। পরবর্তী-কালে ব্রাজিল তিনবার বিশ্বকাপ দখল করলেও ব্রাজিলবাসীরা কিন্তু এই পরাজয় কোনোদিন ভুলতে পারবে না। আর এই পরাজয়ের ফসলরূপেই ব্রাজিল পরবর্তীকালে পেয়েছিল পেলে, ভাভা, ডিডি, জ্যাগালো, গ্যারিঞ্চার মত খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড়।

১৪ বল হেড করবার ভঙ্গিতে পেলে

# পেলের হাজার

না, ১৯৭০-এর বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালে রিভেলিনোর উঁচু ক্রস-সেণ্টারটি শিকারী বিড়ালের মত লাফিয়ে মাথা ঠেকিয়ে ইতালির বিরুদ্ধে যে গোলটি ফুটবলের সম্রাট করেছিলেন, তার কথা আজ লিখছি না। কিংবা ঐ প্রতিযোগিতাতেই চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের হাফ থেকে বল নিয়ে এসে গোল করার ঘটনাও নয়। চল্লিশ গজ দূর থেকে ভলি মেরে উরুগুয়ের গোলরক্ষককে পরাস্ত করার রেকর্ডও হয়তো পেলের স্মৃতিতে এতদিনে ম্লান হয়ে গেছে। স্যাণ্টোসের পেনাল্টি এরিয়া থেকে একক প্রচেষ্টায় বল নিয়ে প্রতিপক্ষ ফ্লুমিনেন্সের সাতজনকে কাটিয়ে যে অনবদ্য গোলটি ফুটবল-মহানায়ক করেছিলেন, তার কথা মনে করেও আজ তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন না। চমকপ্রদ, দর্শনীয় গোল তিনি অনেক দিয়েছেন। গত ২০ বছরে ১৯২১টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় যে ১২৬৮টি গোল তিনি করেছেন তার মধ্যে কয়েক শো তো কেবল তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব। কোন্‌টির কথা ছেড়ে কোন্‌টির কথা তিনি ভাববেন? তবে একটি গোলের কথা পেলে নিশ্চয়ই কোনওদিনই ভুলবেন না—তাঁর সহস্রতম গোল। তার কথাই আজ শোনাই।

বল ধরে এগোচ্ছেন পরে পাস করছেন

১৯৬৯-এর ১৯ নভেম্বর। ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছে সত্তর হাজার মানুষ। শিশু থেকে বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, নানান বয়সের। পেলের দল স্যাণ্টোসের সঙ্গে ভাস্কো-দা-গামা দলের খেলা দেখতে। ঠিক খেলা দেখতেও নয়। ঐ খেলাতে একটি গোল করলেই প্রথম শ্রেণীর খেলায় পেলে হাজার স্পর্শ করবেন। ফুটবলের সুদীর্ঘ ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত হবে। কে না সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকতে চায়?

গোলের সংখ্যা ৯৯৫ হবার পর থেকেই পেলের পিছনে-পিছনে শত-শত সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান ছুটছিলেন। ৯৯৯-এ পৌঁছনোর পরের খেলাটি হয়েছিল সালভাডরের স্টেডিয়ামে। কিন্তু স্থানীয় দলটি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ে গেল। খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হল। অথচ "কালো মুক্তো"-কে সম্বর্ধনা জানানোর আয়োজনের প্রচেষ্টাও সম্পূর্ণ ছিল। স্বয়ং সালভাডরের গভর্নর একটা সোনার মেডেল ও একটা ব্রোঞ্জের স্মারক ফলক তৈরি করিয়ে রেখে দিয়েছিলেন!

এর পরই মারাকানা স্টেডিয়ামে ভাস্কোর বিরুদ্ধে খেলা। রাত নটায় খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু এ কী? পেলে গোল করা দূরে থাক, স্যাণ্টোসই একটা গোল খেয়ে বসল যে! পেলে বারবার এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। বৃথাই। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেনঃ "বারবার পেলে আক্রমণ করতে ছুটছেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই অবধারিতভাবে তাঁর পথরোধ করছেন বিপক্ষের দু'জন, তিনজন, এমন কী সময়বিশেষে চারজন খেলোয়াড়।" গোটা ভাস্কো টিমটাই যেন জীবনপণ করে বসেছে—পেলেকে গোল দিতে দেব না।

কিন্তু স্যাণ্টোসের আক্রমণের তরঙ্গে ভাস্কোর প্রতিরোধের দুর্গ খুব বেশিক্ষণ টিকল না। দ্বিতীয়ার্ধের গোড়াতেই ভাস্কোর রক্ষণভাগের রেনে আত্মঘাতী গোল করে ফেললেন। ১—১। স্যাণ্টোস এবার দ্বিগুণ ভয়াবহ হয়ে উঠল। তাদেরও জিদ চেপে

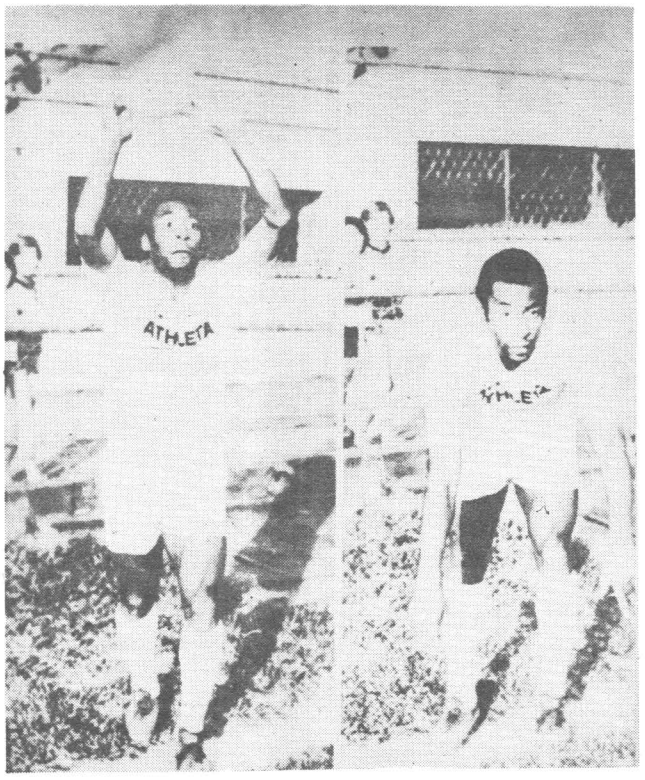

পেলে । গ্রো করবার সময় ও পরমুহূর্তে

গেছে, যেমন করেই হোক, পেলেকে দিয়ে একটি গোল করাতে হবে। যে-ই বল পাক না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে পেলেকে পাস করে দিচ্ছে। খেলাটা যেন পেলে বনাম ভাস্কো! বলা বাহুল্য, সবচেয়ে বেশি ধকল সইতে হচ্ছে ভাস্কো ও আর্জেনটিনার জাতীয় দলের গোলকীপার আন্দ্রাদা-কে। প্রথমার্ধেই তিনি ঠেকিয়েছেন পেলের দুটি মাপা শট। দুটিই ঢুকছিল একেবারে গোলের কোণ দিয়ে। পেলের আর-একটা শট আন্দ্রাদাকে পরাস্ত করেও গোলে ঢোকেনি। নিষ্ফল আক্রোশে ক্রসবারকে নাড়া দিয়ে ফিরে এসেছে।

বত্রিশ মিনিটে নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে পেলেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়াতে স্যান্টোস পেনাল্টি পেল। বলটি পেনাল্টি-স্পটে বসানো হল। দর্শকরা উৎফুল্ল। নিশ্চয়ই পেলে মারবেন। ব্যস, মারলেই গোল, আর গোল হলেই হাজার! আর পায় কে তাদের?

কিন্তু পেলে ইতস্তত করতে লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ফুটবলের সম্রাট কী ভাবছিলেন? জানতে ইচ্ছা করে খুব। সহস্রতম গোলটি পেনাল্টি থেকে দিতে কি তাঁর মন চাইছিল না? নাকি মিস করার ভয় করছিলেন? না বিশ্বরেকর্ডের দুয়ারে এসে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন সেই রাতে?

যা-ই হোক, গোলের পেছন থেকে শত শত সাংবাদিক প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। পেলে যেন ফিরে যেতে চান, বলের দিকে তাকাতেই চাইছেন না। দলপতি আলবার্টো হাত নেড়ে সঙ্কেত করছেন পেলেকে কিক নেবার জন্যে। আর দর্শকরা তো প্রত্যেকেই পেলের নাম জপ করছেন বহুক্ষণ ধরে!

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, কয়েকটি মিনিট এই অবস্থায় কাটল। সারা স্টেডিয়ামে তখন সে এক দারুণ অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।

না, পেলে শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়ালেন কিক নেবার জন্যেই। অল্পগতিতে ছুটে এসে বলটি মারলেন। সকলেই ভাবল বল ঢুকবে উপরে ডানদিকের কোণ দিয়ে। ঢুকল নীচের বাঁ দিকের কোণ দিয়ে! উল্লাসধ্বনিতে মারাকানা স্টেডিয়াম যেন ফেটে পড়ছিল। সব প্রতীক্ষার অবসান। সহস্রতম গোল করলেন এডসন আরান্টেস ডু নাসিমেন্টো তাঁর জীবনের ১০৯৭তম প্রথম শ্রেণীর খেলায়। এখানেই শেষ নয় কিন্তু। পেলে সোজা জালের মধ্যে ঢুকে বলটি কুড়িয়ে নিলেন। পরম আবেগের একটি চুম্বন এঁকে দিলেন ধুলোমাখা শত-লাথি-খাওয়া বলটিতে!

এর মধ্যে অভিনন্দন জানাতে পেলে-অনুরাগীর দল, অতিরিক্ত খেলোয়াড়রা এবং সাংবাদিকরা মিলে কয়েক হাজার লোক মাঠে ঢুকে পড়েছে। রেফারী বাধ্য হলেন খেলা বন্ধ করতে। সবাই মিলে সম্রাটকে কাঁধে করে বেরুবার রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেল। অন্যরাও চাইছিল একটি ঐতিহাসিক ক্ষণে পেলের একটু স্পর্শ পেতে। শত-শত হাত, ডজন-ডজন মাইক্রোফোন তখন পেলের দিকে প্রসারিত।

পেলের কণ্ঠ তখন রুদ্ধপ্রায়। আবেগবিহ্বল। কাঁপা-কাঁপা গলায় মাইক্রোফোনে তিনি কয়েকটি কথা বললেন কোনওরকমে। কী আশ্চর্য! পেলে ফুটবলের 'ফ'-ও উচ্চারণ করলেন না। বললেন, "বন্ধুরা, এই মুহূর্তে—যখন সারা দেশ আমাকে দেখছে, আমার কথা শুনছে—আমি শুধু আপনাদের এই কথাটাই বলি। আমাদের দেশের গরিবদের কথা, ভিখারীদের কথা, যে-সব শিশু আনাহারে থাকে তাদের কথা যেন ভুলবেন না। আসুন, আমরা তাদের সাহায্য করি। আমি নিজে ছেলেবেলায় পেট ভরে খেতে পেতাম না, তাই উপোস দেওয়ার কষ্ট আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। আসুন, আমরা গরিবদের জন্যে যথাসাধ্য করি।"

উপস্থিত সকলের উল্লাসধ্বনিতে পেলের আবেদন ডুবে গেল। শত শত ফ্ল্যাশ-বাল্বের আলো তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। বলটিকে বুকে চেপে ধরে ধীরে ধীরে ড্রেসিং রুমের দিকে চললেন ফুটবলের মহানায়ক। তাঁর দুটো চোখই তখন ভিজে।

**বজ্রসেন**


# কী করে নম্বর বাড়াতে হয়
## সম্পর্কে দুটি অভিমত

লেখাপড়ায় যে-ইস্কুলের সুনামের অন্ত নেই, সেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী সুহিতানন্দ বলেছিলেন: আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীতে "একটা লেখা দেখেছিলাম—কী করে নম্বর বাড়াতে হয়—ওই ধরনের পরামর্শ ভাল, ওতে ছাত্রদের কিছু ব্যবহারিক সুবিধা হয়। আমাদের ছাত্ররা ওটা পড়েছিল।"

১৯৭৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফার্স্ট-হওয়া ছাত্র জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেছিল, "কী করে নম্বর বাড়াতে হয় পড়েছিলাম, ওটা আমাকে খুব সাহায্য করেছিল।"

এবারকার আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীতেও থাকছে পর্ষতের চার-চারজন হেড এগজামিনারের লেখা পরামর্শ

# কী করে নম্বর বাড়াতে হয়

# মানুষ পেলের কথা

## রঞ্জিতকুমার ঘোষ

পেলেকেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়

"পেলে! ঢের হয়েছে, এবার বলটাকে ছেড়ে হোমটাস্কের খাতা নিয়ে বোসো।'

"ছেলেবেলায় মা-র এই ধরনের ডাকগুলো তেমন একটা গ্রাহ্য করতাম না। ফল—লেখাপড়া শিকেয় উঠেছিল। তখন ভাবতাম জীবনে ফুটবলই সব কিছু। লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। বহু বছর পরে বুঝলাম, মা-ই ঠিক বলতেন! ফুটবলই যথেষ্ট নয়। পড়াশোনা আরম্ভ করতে হল আমাকে। স্কুলের পড়া শেষ করলাম। শারীরশিক্ষার একটা উচ্চতর কোর্সও।

"সেইজন্যেই তোমাদের বলছি, লেখাপড়া আর ফুটবল—এ দুয়ের মধ্যে কোনওরকম ঝগড়া নেই। একই সঙ্গে পড়াশোনা এবং ফুটবল চালিয়ে গিয়ে তোমরা উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করতে পারো। না, কেবল পারো নয়। আমি আরও একটু বেশি বলছি। তোমাদের তা' পারতেই হবে।"

বলা বাহুল্য, ফুটবল-সম্রাটের এ-সব কথা ছোটদের উদ্দেশেই। লিখেছেন তাঁর বই "পেলে ফুটবল উইথ পেলে"-তে। কী সুন্দর কথাগুলো! মনে হয় যেন আমাদের একান্ত কাছের কোনও একজন তাঁর বক্তব্য জানাচ্ছেন গল্পচ্ছলে। যে-বক্তব্য সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে, "পেলে, তুমি আবার বই লিখছ কেন?" ফুটবলের পরিভাষা ব্যবহার করেই পেলে তার জবাব দিয়েছেন, "যে-বল আমাকে পাস দেওয়া হয়েছে সেটা আমি ধরেছি এবং আমার সতের বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি তাকে একটু এগিয়ে নিয়ে গেছি। এমনি করেই আমিও প্রাপ্ত সম্পদটি দেবার চেষ্টা করছি ভবিষ্যৎকে। বিশেষত সেই সব তরুণদের, যারা সবেমাত্র জীবনকে আর খেলাধুলোকে ভালবাসতে শিখছে!"

পেলের ঘটনাবহুল খেলোয়াড়-জীবনের সম্পর্কে নতুন করে আজ আর লেখার কিছু নেই। আজ ফুটবল দুনিয়ায় কে না জানে যে, কালো মুক্তোর জন্ম (২৩ অক্টোবর ১৯৪০) এক দরিদ্র নিগ্রো পরিবারে? মাত্র ষোল বছর বয়সেই তাঁর গায়ে ব্রাজিলের জার্সি ওঠে এবং পরের বছরই সুইডেনের বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্ব-কাপ ফাইনালে দুটি গোল। এ-সব তথ্য আজ সকলের মুখস্থ বললেই চলে। ১৯৬২তে প্রথম খেলাতেই আহত হয়ে তিনি যে আর খেলতে পারেননি, আর ১৯৬৬তে একরকম রলেকয়েই যে তাঁকে মেরে মাঠের বাইরে পাঠানো হয়, এ-ও কারও অজানা নয় আজ। ১৯৭০-এর ২১ জুন ফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধে দর্শনীয় হেডে প্রথম গোলটি করে পেলে প্রমাণ করেন, মেরে-ধরে তাঁর আসল ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারা যায় না। গত বিশ বছরে তিনি যে ১৯২১টি খেলায় অংশ নিয়েছেন, তাতে গোল করেছেন ১২৬৮টি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বিদেশী পত্রিকায় এই হিসাবটি পেয়েছিলাম। তারপর এতদিনে ঐ সংখ্যা আরও কিছু বেড়েছে। এই তো ২০ জুন তাঁর বর্তমান ক্লাব নিউইয়র্কের কসমসের হয়ে টাম্পা বে রাউডিজ দলের বিরুদ্ধে তিনি হ্যাট্‌ট্রিক করলেন।

শুধু খেলার সময়েই নয়। পেলে সব সময়ই খবর। পৃথিবীর সর্বত্র। তা তিনি মাঠের মধ্যে থাকুন আর বাইরেই থাকুন। মিউনিখে (১৯৭৪) বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় দর্শকের আসনে থেকেও তিনি রোজই খবরের কাগজ ও টেলিভিশনের সংবাদের বিষয়বস্তু হতেন। আর গত বছরের ফেব্রুয়ারির গুজবের কথাও সকলের মনে আছে। রটে গেল, পেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। কী ব্যাপার? না নাইজিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টার সময় পেলে ছিলেন লাগোসের বিমানঘাঁটিতে। বিমানঘাঁটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তাই। পরে অবশ্য পেলের স্ত্রী জানান, পেলে নিরাপদেই আছেন। কয়েক কোটি লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। এ-সব বাদ দিয়ে আমাদের ঘরের কথাটাই ধরা যাক না। কল-কাতায় আসার কথা তো পেলের একার নয়, নিউইয়র্কের গোটা কসমস ক্লাবেরই। উত্তর আমেরিকা ফুটবল লীগের এই দলটি কয়েক কোটি টাকা দিয়ে গড়া। সেখানে অনেক নামী-দামী খেলোয়াড় আছেন ; এই বছরই বহু লাখ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সর্বজনপরিচিত ফ্রানজ বেকেনবাউয়ার। কিন্তু হলে কী হবে, সবাই বলছি বা শুনছি পেলে আসছে, পেলের খেলা দেখে জীবন সার্থক করার সুযোগ পাওয়া যাবে, পেলে-র টিকিট এক-খানা কোনও মতে জোগাড় করতেই হবে ইত্যাদি। এমনই তাঁর জনপ্রিয়তা। হোয়াইট হাউসের সেই ঘটনার কথা আজও অনেকে ভুলে যায়নি। সেবার পেলে দেখা করতে গেছেন রাষ্ট্রপতি ফোর্ডের সঙ্গে। হাজার হাজার কিশোর-তরুণের ভিড়। রাষ্ট্রপতি ও ফুটবলসম্রাট এগিয়ে গেলেন তাদের কাছে। শত শত আগ্রহী হাত অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দিল। শুধু পেলের দিকেই, ফোর্ডের দিকে নয়। ব্যাপারটি লক্ষ করে ফোর্ড হাসলেন। বললেন, "আমি আমেরিকার প্রেসিডেনট ঠিকই, কিন্তু তুমি তারও উপরে।"

ব্রাজিলের জাতীয় দল থেকে পেলে অবসর নিয়েছেন কি আজ? সেই ১৯৭১-এর ১৮ জুলাই। তার তিন বছর বাদে স্যানটোস ক্লাব থেকেও। কিন্তু তাতে কী? তাঁর জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র কমেনি। বরং তুঙ্গে। তিনটি মরশুমের জন্যে কসমস ক্লাব তাঁকে যা দিয়েছে, সেটাও তাঁর জনপ্রিয়তারই সাক্ষ্য দেয়। ট্যাক্স বাদে চার কোটি টাকা আর প্রমোদভ্রমণের জন্যে একটি নৌকা। এ-ছাড়া নিউইয়র্কে একটি ফ্ল্যাট। সেখান থেকে তিনি ব্রাজিলে তাঁর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অফিসারদের সরাসরি নির্দেশ দিতে পারবেন রেডিও টেলিফোনের মাধ্যমে। এ-সব তথ্যও

থাক। পেলের শুধু পা দুটিই বিমা করা আছে দশ লক্ষেরও বেশি মার্কিন ডলারে!

কথায় বলে "নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা"। এ-কথা আর যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হোক, পেলের ক্ষেত্রে নয়। কখনোই নয়। আজকের কোটিপতি পেলে কি কম দরিদ্র ঘরের ছেলে? অথচ সত্তর হাজার লোকের সামনে তিনি অনায়াসে ঘোষণা করেছেন, "আমি ছেলেবেলায় খেতে পেতাম না।" (এ-রকম স্বীকারোক্তি কতজনের পক্ষে সম্ভব জানি না। ধনী হবার পর অতীতের দৈন্যদশার দুঃস্বপ্ন স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টাটাই তো সবাই করে দেখেছি।) কথাটি বলেছিলেন পেলে মারাকানা স্টেডিয়ামে ১৯ নভেম্বর ১৯৬৯-এর সেই স্মরণীয় রাত্রিতে, যখন ৯০৯নং প্রথম শ্রেণীর খেলায় সহস্রতম গোলটি করার পর বিভিন্নরকমের অভিনন্দনে তিনি প্লাবিত হয়ে গিয়েছিলেন। পরম আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রতিভাষণে তিনি ফুটবল সম্পর্কে একটিও কথা বললেন না। শুধু বললেন তাঁর দেশের গরিবদের কথা। ('পেলের হাজার' লেখাটি দ্যাখো।)

কসমসে যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রতিদিনই পেলে ব্রাজিলের কিশোরদের ফুটবল কোচিং করেছেন। বিনা দক্ষিণায়। এখনও তিনি ব্রাজিলকে সাহায্য করতে আগ্রহী। না, খেলোয়াড় হিসাবে নয়। প্রধান কোচ হয়েও না। জাতীয় দলের কোচ অসওয়ালডো বারনাডাও আছেন, তিনিই থাকুন। কিন্তু আগামী বছর বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিলের দল গড়ার ব্যাপারে যদি পেলের সাহায্য চাওয়া হয়, তবে অন্তরাল থেকে তিনি তা করবেন। এর অর্থ জলের মত সহজ। কোচিংয়ে বারনাডাওয়ের প্রাধান্য মেনে নিয়ে এবং তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ না করেও পেলে ব্রাজিলের জন্য কিছু করতে প্রস্তুত। দেশে-বিদেশে কোচিং নিয়ে নানা রকম মনোমালিন্য, তিক্ততা ও রাজনীতির কথা আমরা যতটা জানি, তারপর পেলের এই ঘোষণায় শ্রদ্ধা জাগে না কি?

দেশ এবং দারিদ্র্যের মতো পেলে ভোলেননি তাঁর মাতা-পিতাকে। আর ঈশ্বরকে। একবার এক সাংবাদিক পেলেকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি যদি ফুটবল-সম্রাট না হয়ে অন্যভাবে বিখ্যাত হতেন, তা হলে কে হতে চাইতেন?" পেলের উত্তর—"দোনাদিনহো, আমার বাবা।" আর ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "ভগবান আমাকে যা দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

এই হচ্ছেন পেলে। আশ্চর্য মানুষ! বিশ্বজোড়া সম্মানের শিখরে উঠেও এতটুকু অহঙ্কার নেই। খ্যাতি, জনপ্রিয়তা, অর্থ, প্রতিপত্তি, এর কোনওটিই তাঁকে একচুলও বদলাতে পারেনি। স্যান্টোসে প্রথম যেদিন তিনি আসেন, সেদিনের সেই পনের বছরের কিশোরটিই রয়ে গেছেন এখনও। বলেন, "সারা জীবনে যা দেখেছি আর শিখেছি তার থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে আমরা সবাই সমান। সবাই ভাই ভাই।" অন্যত্র: "আমার মাঝে-মাঝেই মনে হয়, লোকে আমাকে যা বলে আমি তা নই। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি একা নই। আজ যা হয়েছি, তার জন্যে আমি অনেক লোকের কাছেই ঋণী। প্রত্যেকেই নিজের-নিজের রীতিতে আমাকে কিছু-না-কিছু শিখিয়েছেন। আমার প্রশিক্ষকরা, পূর্ববর্তী খেলোয়াড়রা, মা-বাবা, সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন।"

আমরা অনেকেই একটা কথা বলি। পেলে একজন "বর্ন্ ফুটবলার"। তাঁর প্রতিভা সহজাত, স্কিল ভগবৎদত্ত। যেজন্যে দ্বিতীয় পেলে কোনওদিন হবে না। কিন্তু পেলে নিজে বলেন, "বর্ন্ ফুটবলার বলে কিছু আছে, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। কিছু স্কিল আর প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মাতে পারে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, সেরা ফুটবলার হয়েই একজন জন্মায়, এটা আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়। সাফল্য রাতারাতি আসে না। কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, শিক্ষা, অনুশীলন, ত্যাগ এবং সবচেয়ে বড় কথা, তুমি যা করছ বা করতে শিখছ তাকে ভালবাসা—এই হল সাফল্য।"

তরুণ শিক্ষার্থীদের যে-সব উপদেশ পেলে দিয়েছেন, তা থেকেও মানুষ পেলের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "সফল হও বা বিফল হও, মানুষ হও। শুধু এই-ভাবেই তুমি আত্মসম্মান বজায় রাখতে এবং দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবে।" অন্য এক জায়গায় বলেছেন, "কক্ষনো নিজেকে সবজান্তা মনে করবে না। সব সময়ই আরও বেশি শেখার আছে এবং প্রত্যেক দিনই আমরা কিছু-না-কিছু নতুন জিনিস শিখি।" আবার এক জায়গায়, "ফুটবলার হবার আগে অ্যাথলীট হও। আর অ্যাথলীট হবার আগে মানুষ হও।"

সবচেয়ে মজার কথা কী বলেছেন? "তুমি 'তুমি'ই হও। কাউকে নকল করতে বা কারও মত হতে যেও না। নিজস্ব স্টাইল গড়ে তোলো। চেষ্টা করে নিজেকে একজন 'পেলে' বানাতে যেও না। 'পেলে' হওয়ার থেকে অনেক বেশি বড় 'তুমি' হওয়া।"

পেলেকে বলা হয় কমপ্লিট ফুটবলার। না, তিনি আরও অনেক বেশি। বলতে ইচ্ছা করে, তিনি একজন কমপ্লিট মানুষ।

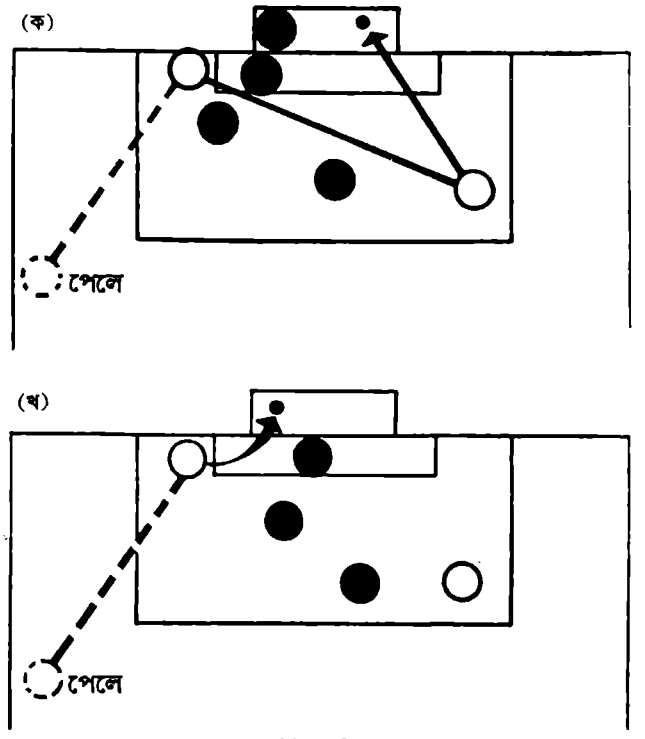


**পেলের আক্রমণের দুটি ভঙ্গি**

(ক) বল নিয়ে বাঁ-দিক থেকে দৌড়ে পেলে একেবারে গোল-পোস্টের কাছাকাছি গিয়ে হাজির হয়েছেন। ওই অবস্থায় গোলকীপার তাঁর শট্ আটকাবার জন্য পজিশন নিয়েছেন গোলপোস্টের ডান-দিক ঘেঁষে। পেলে তাই নিজে শট নিলেন না, প্রতিপক্ষের দুজন ডিফেন্ডারের মাঝখান দিয়ে বল পাঠিয়ে দিলেন মাঠের অন্যদিকে, যেখান থেকে তাঁর দলের অন্য-খেলোয়াড় গোলকীপারের বাঁ-দিক দিয়ে চকিত শটে গোল করতে পারেন। আবার, ওই একই অবস্থায়...

(খ) পেলে নিজে শট্ না-নিয়ে মাঠের অন্যদিকে বল পাস্ করতে পারেন ভেবে গোলকীপার তক্ষুনি-তক্ষুনি ডাইনে ঘেঁষে পজিশন নিলেন না। ফলে, বল পাস না-করে, পেলে নিজেই শট্ নিলেন, এবং গোলকীপার ও গোলপোস্টের মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে গোল করলেন। বল কীভাবে বাঁক নিয়ে গোলে ঢুকছে, দ্যাখো।

# পেলে, সতেরো বছর বয়সে

চিরঞ্জীব

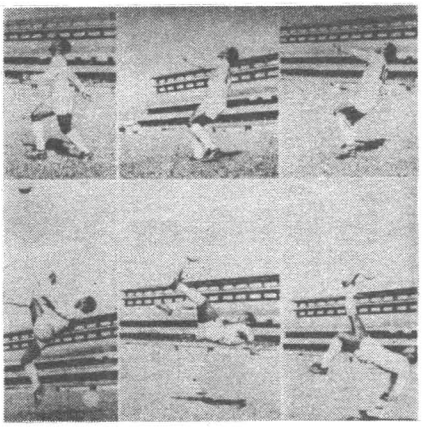

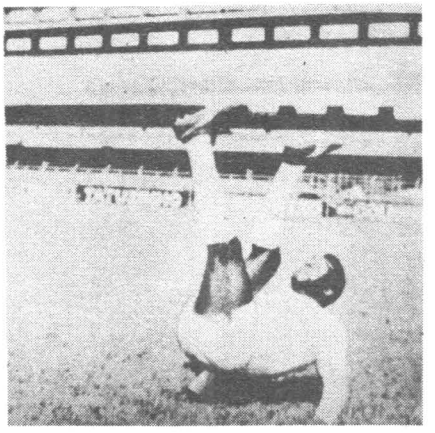

পেলে । বল থামাবার ও কিক করবার হাজার ভঙ্গির কয়েকটি

পেলে তখন সতেরোয় পা দিতে চলেছেন। ব্রাজিলে ফুটবলের সমস্ত দায়িত্ব ভিসেন্ট ফিওলার উপর। ফিওলার আগ্রহেই ১৯৫৭য় ব্রাজিল দলে প্রথম নির্বাচিত হলেন পেলে। না, বিশ্বকাপে নয়—কোপা রোকায় আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলা রোকা কাপ টুর্নামেন্টের। ম্যানেজার ফিওলা স্বদেশের নানা ম্যাচে পেলেকে দেখেছিলেন। তবুও সংশয় কাটেনি। কী জানি, কেমন খেলবে বড় ম্যাচে! ও'র সম্পর্কে ফিওলার আশাও কম নয়। মনে-মনে ঠিক করেছেন, রোকা কাপে ভাল খেললে ১৯৫৮-র বিশ্ব-কাপের জন্য তিনি ওঁকে নেবেন। রোকা কাপের প্রথম ম্যাচের দিন ফিওলার নির্দেশে পেলে ড্রেস করলেন ; ওয়ার্ম আপও। কিন্তু রেফারির হুইশিলের পর যে এগারোজন মাঠে নামল, তার মধ্যে পেলে নেই। সাইড লাইনের ধারে তাঁর স্থান হল। প্রথমার্ধ কাটল, বিরতি শেষ। তারপর আরও কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত। ব্রাজিল দলে খেলোয়াড় পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু বদলে পেলেকে নামানো হল না। দ্বিতীয়ার্ধের অর্ধেক কেটে গেল। ফল ০—০। ব্রাজিল ভাল খেললেও গোল হচ্ছে না। ফিওলা আর দেরি না করে ডেল ভেরিওকে উইথড্র করে পেলেকে নামালেন। দশ মিনিটের মধ্যেই পেলের গোলে ব্রাজিল জিতল। দ্বিতীয় ম্যাচ সাওপাওলোয়। ফিওলা এবার আর গড়িমসি করলেন না। গোড়া থেকেই পেলেকে নামালেন। ওদিন ব্রাজিলের ২—০ জয়ের প্রথম গোলটি পেলের। ৩—২ গড়ে ব্রাজিল রোকা কাপ জিতল। ওর পরই সাওপাওলো লীগে স্যান্টোস দলের পেলে লীগের টপ স্কোরার হলেন ৩৬ গোল দিয়ে।

ওদিকে সুইডেনে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপের তোড়জোড় চলছে।


পরীক্ষার্থীদের জন্য
এবারকার আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীতে
অতিরিক্ত আকর্ষণ
মধ্যশিক্ষা পর্ষতের জনৈক কর্মকর্তার লেখা
'পর্ষৎ কীরকম উত্তর চান'


প্রস্তুতি দেশে-দেশে। ফিওলা তাঁর ব্রাজিলকে দারুণভাবে গড়ে তুললেও কোয়ালিফাইং ম্যাচগুলোর কয়েকটিতে রীতিমতো যুঝতে হল। রিওতে পেরুর বিরুদ্ধে শেষ খেলায় ডিডি-র ফ্রি-কিকে জিতল ব্রাজিল। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সুইডেনের পত্র-পত্রিকায় ব্রাজিল সম্পর্কে নানা আলোচনা প্রকাশিত হল। ফিওলার যে ইণ্টারভ্যুটি বেরোল তাতে দেখা গেল তিনি দুজনের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছেন। একজন আউটসাইড রাইট গ্যারিঞ্চা, দ্বিতীয়জন পেলে। পেলে সম্পর্কে ফিওলা বললেনঃ বয়স সতেরো হলে কী হবে, ব্রাজিলে এমন খেলোয়াড় আজও জন্মগ্রহণ করেনি। কিন্তু সে আহত। ফিওলার শেষ তিনটি কথায় অন্যদের মধ্যে আশা জাগল। তাহলে ব্রাজিল ফেভারিট নয়? আর ভয় ব্রাজিল-সমর্থকদের।

ফিওলা দল নিয়ে গোটেবার্গে পৌঁছলেন গ্রুপ ম্যাচে খেলতে। কিন্তু ম্যানেজার তাঁর সেরা খেলোয়াড়কে সঙ্গে আনতে পারেননি। হাঁটুর আঘাতের জন্য পেলে তখনও ব্রাজিলের এক হাসপাতালে। গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচের দুদিন আগে হঠাৎ পেলে এলেন। ফিওলা ভয়ে-ভয়ে ওঁকে নামালেন সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে। রাশিয়ার গোলে তখন সর্বকালের সেরা লেভ ইয়াসিন। পেলে কিক-অফের সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াসিনকে পরাস্ত করেন। অবশ্য গোল হয়নি, বারে লেগে ফিরে এসেছিল। ওই ম্যাচ দেখে সকলেই মন্তব্য করেছেন পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতার এই স্ট্রাইকিং ইনসাইড ফরোয়ার্ড সম্পর্কে, "পেলে, জাগ্‌লার অফ দ্য বল।"

চতুর্থ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল গেল কোয়ার্টার ফাইনালে। তৃতীয় গ্রুপের রানার্স ওয়েলসের বিরুদ্ধে তাদের খেলা। ওয়েলস সেদিন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জন চার্লস ছাড়াই খেলছে। তবুও ব্রাজিল কিছুতেই ওয়েলস-ডিফেন্সকে ভেদ করতে পারছে না। প্রথমার্ধ ০—০ রইল। বিরতির পরেও লড়াই চলেছে সমানে। ছেষট্টি মিনিট পরে ওয়েলস-গোলরক্ষক কেলসি পরাস্ত হন। পেলে আজও বলেনঃ ওটি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোল। ব্রাজিল সেমিফাইনালে উঠল ওই একটি গোলেই। স্টকহোমে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ৫—২ জয়ের তিনটি গোল যদিও পেলেরই, তবে তা নিয়ে পেলে তেমন কিছু বলেন না। তবে ফাইনালে সুইডেনের বিরুদ্ধে ৫—২ গোলের দুটি পেলের (বাকিগুলি ভাভা—২ ও জাগালো—১)। এবং বলাই বাহুল্য পেলে অতঃপর ইতিহাস।

# ভুতুড়ে গাড়ি

বাড়িঘর সব ভাঙতে এসেছে একদল লোক ...তাদের মস্ত-মস্ত হাতুড়ির ঘায়ে মধ্য-সানফ্রান্সিসকোর একটা বিরাট এলাকা জুড়ে ভেঙে পড়তে লাগল বিশাল বাড়িগুলো...
দুম!

দুম! দুম!

কোটিপতি অ্যালোঞ্জো হক্ বিরাট একটা বাড়ি বানাতে চান, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরনো ধাঁচের এই বাড়িটা...বাড়ির মালিক এখন বিধবা বুড়ী স্টেইনমেৎস্...
'হক্'...একশ তিরিশতলা প্রাসাদ তৈরি হবে এখানে...
'হক'

বাড়ির ভিতরে...
রিরিং রিরিং...
ওঃ! আবার সেই হকের জ্বালাতুনি!

নমস্কার, আমি মিঃ হকের ভাগ্নে উইলোবি হুইটফিল্ড্...
816
তা বাছা, তোমাকে ত বেশ ভদ্দরলোকেদের মত দেখতে! ওই বুড়ো যে সব বজ্জাতকে পাঠায়, একটুও তাদের মত নয়!
53

আমার মামা আমাকে বলতে পাঠালেন যে...
মনে হচ্ছে আমার ভাড়াটে নিকোলে এল যেন...মেয়েটা এরোপ্লেন কম্পানিতে কাজ করে...
5-5

নিকোলে, পরিচয় করিয়ে দিই, মিঃ হকের ভাগ্নে...
!

দুম!
(পাতা ওল্টাও)

এটা হল প্রথম দর্শনেই বিদ্বেষের একটা ব্যাপার...
ওঃহো! খুব লেগেছে মিঃ হুইটফিল্ড?

হাতে চোট পেয়েছ তো?
ঠিক উল্টোটা, চমৎকার লাগছে!

সদ্য আইন পাশ করে এই প্রথম উইলোবি এসেছে তার মামার কাজ নিয়ে...
নিকোলে, ভদ্রলোকের সঙ্গে দিব্যি আমার আলাপ হচ্ছিল...
এখন আপনার ঘুমোনোর সময় ...ভদ্রলোককে বাইরের রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি!

দয়া করে শুনুন একটু ...এই আমার প্রথম কাজ ...আমার মামা...
কেটে পড়ুন!

কিন্তু ভেবে দেখুন একজন বৃদ্ধা মহিলার পক্ষে এখানে একা থাকা...
একা? কেন আমি আর হার্বিও তো সঙ্গে আছি!
53

হার্বি?
হ্যাঁ, এই হচ্ছে হার্বি। জানেন, খুবই জ্যান্ত এই গাড়িটা!
53
5-12

এই বিতিকিচ্ছিরি গাড়িটা?
তাই নাকি!
Distributed by King Features Syndicate.

একবার চাপবেন নাকি?
কিন্তু...আমি তো ভাবছিলাম ভীষণ চটেছেন আপনি!
এরপর আগামী সংখ্যায়

# সুরজিৎ দাশগুপ্ত বাঘ বন্দী

গায়ে তার কালো কালো দাগ, এক ছিল বুভুক্ষু বাঘ। কতদিন পেট ভরে খায়নি। পাখি, ব্যাঙ, মাছ—এসবে কি পেটের জ্বালা নেবে? শেষে সজনেখালির জঙ্গল ছেড়ে বাঘটা বেরিয়ে এল নদীর ধারে।

ওপারে মানুষের বসতি। মানুষের নখে দাঁতে ধার না থাকলেও তাদের অনেক ভীষণ-ভীষণ হাতিয়ার আছে। তবু যদি মানুষ এড়িয়ে এক-আধটা গরু ধরা যায়, এই ভেবে নদী পেরিয়ে বাঘ এল দয়াপুর গ্রামে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একটা গোয়ালে ঢুকল।

সবে গরুটা মেরেছে। এমন সময়, ও কে? গোয়ালের দরজায় ও কে? এ যে মানুষের মেয়ে। মানুষ মানেই সাক্ষাৎ যম। না, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।

বাঘ বেরিয়ে পড়ল গোয়াল থেকে। এবার? মানুষ দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু বাতাসে মানুষ-মানুষ গন্ধ। খাঁ খাঁ পথঘাট অন্ধকার। তবু কারা যেন নজর রাখছে। বন্ধ দরজা-জানলার পেছনে কাদের যেন ফিসফাস। বাঘের গা-টা ছমছম করে উঠল একটা অজানা ভয়ে।

তবে কি ফিরে যাবে বনে? কিন্তু পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা। সাহসে ভর দিয়ে আরও কিছুক্ষণ খুঁজেই দেখা যাক, নিরিবিলিতে কিছু খাবার মেলে কিনা। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ খেয়াল হল, বস্ত দেরি করে ফেলেছে। আলো ফুটলেই মানুষ বেরিয়ে পড়বে। তারপর?

এই তো লুকোবার ভাল জায়গা পেয়েছে। দু দিক খোলা একটা ঘর। আজকের মতো এখানেই লুকিয়ে থাকা যাক, দিন কাবার হলে সন্ধে বেলায় আবার খাবারের খোঁজে বেরোবে। বাঘ তো ঢুকল একটা হেঁসেল ঘরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই, কিছু বোঝার আগেই দু দিকের খোলা পথই বন্ধ হয়ে গেল। আতঙ্কে দিশাহারা বাঘ ঘর জুড়ে দাপাদাপি আর তর্জনগর্জন শুরু করল। কিন্তু কোনও দিকে পালাবার পথ খুলল না। বহুদিন অভুক্ত থেকে শরীরও দুর্বল। হায়, হায়, এ কী হল!

এভাবে কতক্ষণ কাটল কে জানে। বন্ধ ঘরে থেকেও টের পেল, আকাশের সূর্য একদিকে উঠে উলটো দিকে নেমে পড়তে শুরু করেছে। বাইরে লোকজনের সাড়াশব্দ। অনেক লোক জড়ো হয়েছে বোধ হয়। এখন তাদের খুব সাহস। চড়া গলায় কথা বলাবলি করছে। কী বলছে ওরা? ভয়ে বাঘের হাত-পা সিঁটিয়ে আসে। শরীর অবশ। গর্জন করার শক্তিও ফুরিয়ে গেছে। হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ খুট করে একটা চাপা শব্দ। বাঘটা চকিতে বুঝল, ভীষণ বিপদ। কিন্তু কোন্ দিক থেকে আসছে? সমস্ত শক্তি দিয়ে চারপাশের বাধা ভেঙে বেরোবার চেষ্টা করল। একবার সমস্ত শক্তি দিয়ে গর্জন করে মানুষের দুঃসাহস ভাঙার চেষ্টা করল।

কী এসে লাগল বাঘটার গায়ে। আচমকা আঘাতে ধক করে উঠল তার বিরাট শরীরটা, কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে। শরীরের শিরা-উপশিরায় ঝাঁকে ঝাঁকে ছুঁচ ছুটে চলেছে। চারপাশের সবকিছু হঠাৎ ঘুরপাক খেতে শুরু করল। চোখের সামনে যেন বর্ষায় দুর্দান্ত নদীর ঘূর্ণি। হুঙ্কার দিয়ে ঘূর্ণিটা থামাবার চেষ্টা করল। আবার কী একটা আচমকা এসে লাগল। নিমেষে বিশাল বাঘটা একটা বিরাট নিকষ কালো ঘুমের জালে জড়িয়ে গেল, আস্তে করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ঘুম ভাঙতেই শুনতে পেল, দূরে অনেক মানুষের চিৎকার—চেঁচামেচি। না দূর থেকে নয়, কাছে থেকেই আসছে আওয়াজ। এত কাছে মানুষের হট্টগোল শুনেও বাঘটার কোনও ভয় করল না। ভয় পাওয়ার ক্ষমতাটাই ফুরিয়ে গেছে তার। কোনোমতে চোখ মেলে দেখল, তার শরীরের মাপে একটা খাঁচায় সে বন্দী। খাঁচার উপর মধ্যে-মধ্যে ধুপধাপ করে ঢিল, কাদার তাল, ইঁটের টুকরো পড়ছে। তবু চোখ খুলে রাখতে পারছে না, খালি ঘুমিয়ে পড়ছে। ঘুমিয়েই পড়ল আবার।

ভাগ্যিস কিছু মানুষ ছিল যারা হাজার হাজার মানুষের হাত থেকে ঘুমন্ত বাঘটাকে বাঁচাবার জন্যে একটা নৌকার উপর খাঁচাটা তুলে দিয়ে নৌকোটাকে মাঝনদীতে নিয়ে গিয়েছিল। নদীপথে খাঁচার বন্দী বাঘ এল ক্যানিং পর্যন্ত। সেখান থেকে লরিতে চড়ে চিড়িয়াখানায়।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় আরও অনেক বাঘ আছে। কিন্তু এর একশো দু বছরের ইতিহাসে সুন্দরবনের বাঘ এল এই প্রথম। তাছাড়া এখানকার প্রায় সবগুলো বাঘই জন্ম থেকেই চিড়িয়াখানায় আছে।

চিড়িয়াখানার বাঘ আর বনের বাঘে অনেক তফাত। চিড়িয়াখানার বাঘ প্রত্যেকবার বাঁধা সময় বাঁধা মাত্রায় খাবার খায়। পেটের জ্বালা, শিকারের উৎকণ্ঠা কি উত্তেজনা, কিংবা শিকার ফসকে যাওয়ার হতাশা—এসবের কিছুই চিড়িয়াখানার বাঘ জানে না। সে জানে শুধু শুয়ে বসে আয়েস করা। এমন কী খাবার জলটা পর্যন্ত সে মুখের সামনে পেতেই অভ্যস্ত।

ফলে চিড়িয়াখানার বাঘ আর বনের বাঘে বুদ্ধি আর শক্তির, সামর্থ্য আর সাহসের অনেক তফাত। বনের বাঘ অনেক বেশি কষ্ট অনেক সহজে সহ্য করে। প্রত্যেক মুহূর্তে তাকে অনেক বিপদ-বাধা বাঁচিয়ে চলতে হয়, প্রত্যেক মুহূর্তে তাকে অজানা সব আপদ-বিপদ সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হয়। দিনের পর দিন তাকে অভুক্ত অবস্থায় খাবার খুঁজে বেড়াতে হয়, প্রচণ্ড পিপাসা নিয়ে তাকে মাইলের পর মাইল হেঁটে জল খেতে যেতে হয়।

বনের বাঘের কোনও নির্দিষ্ট এলাকা নেই। যেখানে খুশি ঘুমোয়, যেখানে খুশি চলে যায়। কিন্তু চিড়িয়াখানার বাঘ নিজের খাঁচার মধ্যে থাকে, সেই খাঁচার উপর তার একার অধিকার, তার জায়গায় কেউ অংশীদার নেই। ধরা-বাঁধা একটা সীমানার মধ্যে থাকতেই সে অভ্যস্ত। আর বনের বাঘ বিরাট এলাকা জুড়ে ক্রমাগত ঘুরে বেড়ায়। তবে মানুষের বসতি তারা সাধারণত এড়িয়ে চলতেই চায়। কিন্তু মানুষের বসতি যে ক্রমশই বনের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বনের বাঘ তাহলে কী করবে?

বাঘের কাছে মানুষ বড় ভয়ঙ্কর। কিন্তু অশক্ত কি অভুক্ত বাঘের কাছে মানুষ শুধু ভয়ঙ্কর নয়, খাদ্যও বটে। কত মানুষ শুধু শখ মেটাতে কি বাহাদুরি করতে কত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বাঘ মেরেছে। বাঘও তেমনই প্রিয় খাদ্যের জন্যে অনেক সময় দারুণ ঝুঁকি নিয়েও মানুষ মারে। তাছাড়া সব মানুষই তো আর ভয়ঙ্কর নয়। অনেক মানুষ একেবারেই অসহায়। তবে মানুষখেকো বাঘ আর বাঘশিকারী মানুষ দুইই ভয়ঙ্কর—বাগে পেলে কেউ কাউকে ছাড়ে না।

মানুষ নিজের খিদে মেটাতে রোজ কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী হত্যা করে। বাঘ অন্য শিকার না-পেলে নিরুপায় হয়ে তার খাবার হিসেবেই মানুষ মারে। মানুষ কিন্তু খাবার হিসেবে কখনও বাঘ মারে না। বাঘের মাংস ভীষণ শক্ত। খাবে কী করে? আবার এ-ও শুনেছি, একজন বাঘের মাংস খেয়ে নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিল। আমি অনেক জীবজন্তুর মাংস চেখে দেখেছি, কিন্তু বাঘের মাংস চাখিনি।

তবে এটা ঠিক, বাঘের গতিবিধি জানা থাকলে, মানুষের খুবই সুবিধে হয়। এজন্যে দরকার ক্যাটাসেট নামে একরকম রাসায়নিক ওষুধ। ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের মতো একরকম গুলির ভেতরে থাকে এই ক্যাটাসেট। গুলিটার পেছনে চারটে ছোট ছোট পাখনা। এই গুলি বাঘের শরীরে ঢোকা মাত্র ক্যাটাসেট ছড়িয়ে পড়ে বাঘের শরীরে আর সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমে ঢুলে পড়ে।

এবার বাঘের গলায় একটা 'রেডিও কলার' বেঁধে দেওয়া দরকার। তাহলে বাঘটা যখন যেখানে যাবে তখনই সেই জায়গাটা জানা যাবে 'রেডিও কলার' থেকে পাঠানো বেতার সংকেতে।

গত ১৪ জুলাই দয়াপুর গাঁয়ে যে-বাঘটা ধরা পড়েছে তার গলায় 'রেডিও কলার' বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা এ নিয়ে নানারকম মত দেখা যাচ্ছে। এক দলের মত এই যে, সুন্দরবনের বাঘ মানেই মানুষখেকো বাঘ। মানুষখেকো বাঘের স্বভাব-চরিত্র, অভ্যেস-রুচি এসব নিয়ে গবেষণার এমন সুযোগ ছাড়া বোকামো।

সে যাই হোক, সুন্দরবনের ভীষণ ধূর্ত আর প্রকাণ্ড বাঘ যে এখন চিড়িয়াখানার খাঁচায় আছে, এটাই একটা বিরাট খবর। কেউ তার নাম দিয়েছে 'দয়ারাম' আবার কেউ নাম দিয়েছে 'বনবিহারী'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার 'দক্ষিণ রায়' নামটাই বহাল থাকবে মনে হচ্ছে। সুন্দরবন এলাকার অধিপতি দক্ষিণ রায় আসলে ব্যাঘ্র-দেবতা। এখনও এই এলাকার নানা জায়গায় খুব ভক্তির সঙ্গে তাঁর পুজো হয়। এই দেবতার সবচেয়ে বড় মন্দির আছে ধপধপিতে।

একটা সময়ে মানুষ এমন নির্বিচারে বাঘ মারা শুরু করেছিল যে, দুমদাম করে বাঘের সংখ্যা কমে যেতে শুরু করেছিল। কমতে কমতে খাস সুন্দরবনেই বাঘের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৬২-তে। অকারণে বা শখের জন্যে বা ব্যবসায়ের জন্যে বাঘ মারা বন্ধ করার ফলে ওই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮১টিতে—মাত্র পাঁচ বছরে।

এই হারে যদি বাঘ বাড়তে থাকে তাহলে বাঘের উৎপাত শুরু হবে আবার। কিন্তু বাঘ মারা বন্ধ না করলে দেশ থেকে বাঘের বংশ লোপ পেয়ে যাবে। সমস্যা হচ্ছে, কী করে বাঘের বংশ বাঁচানো যায়, আবার মানুষের বংশও বাঁচানো যায়। এই যুগটাকে সবার জন্যে বাঁচার যুগে পরিণত করাই হবে এই যুগের সবচেয়ে বড় কীর্তি।

**ফোটো** তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

# বিন্দুবিসর্গ

**কুম্ভক**

আমার চশমাটাকে নাকের ডগায় বসিয়ে টুম্পি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে : আর, বিসর্গ ?

মানে ?

অনুস্বর বললে সেদিন, বিসর্গ দিয়ে বলার কিছু নেই ?

তা আর নেই ? ঢের আছে।

নন্তু বলল : বিসর্গ জানতে চাস টুম্পি ? তাহলে একবার মেঘনাদবধকাব্য পড়। বিসর্গে বিসর্গে অন্ধকার দেখবি সব।

কীরকম ?

এই ধর্, যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে।

উরেব্বাস্ ! ওর মানে কী ?

নন্তু এবার চুপ। কাজেই বলতে হল আমাকে : ওর মানে, সাগরের তট যেন ঢেউয়ের আঘাতে।

ইস্ ! এর জন্যে এত বিসর্গ ? তুলে দিলেই হয়।

কী তুলে দিলে হয় ? বিসর্গ ? যাদপতি রোধ যথা চলোর্মি-আঘাতে, এইভাবে বলব ? কেমন লাগছে শুনতে ?

বিচ্ছিরি।

অবিশ্যি কেবল শোনা নিয়েই কথা নয়। মানেও যে একটু পালটে যায়। রোধঃ বা রোধস্ হলো তট, কূল। আর রোধ হল বাধা দেওয়া প্রতিহত করা।

তাহলে 'একটু' বললে কেন ? এ তো অনেকখানি পালটে গেল।

আসলে অনেকখানি নয়। লক্ষ করে দেখ, দুটোর মধ্যে একটা যোগ আছে। জলধারাকে বাধাই তো দিচ্ছে নদীর তট ? একই দিক থেকে তৈরি হচ্ছে দুটো শব্দ। আর তা ছাড়া.....

বাধা দিল নন্তু, বলল : কিন্তু বাঙলায় ওসব রোধঃ-টোধঃ চলবে না। মধুসূদন ছাড়া আর কি কেউ লিখবেন ওরকম ? ও নিয়ে আমরা ভাবছি কেন ?

আমরা কই ভাবছি ? শব্দটা বললি তো তুই। আমরা ভাবছিলাম বিসর্গের কথা। ধর্ অন্তঃ শব্দটা থেকে বিসর্গ তুলে দিলি তুই। কী কাণ্ডটা হবে তা হলে ?

কী হবে ?

শেষ হয়ে যাবে সব ! অন্ত হয়ে যাবে !

অন্তঃ কী ? কেউ বলে না কি ও-রকম ?

আলাদা করে বলে না হয়তো। কিন্তু সঙ্গে কিছু জুড়ে দিয়ে তো হামেশাই বলে। অন্তঃপুর, অন্তঃকরণ—এসব কী ? তুলে দেওয়া যাবে এসব বিসর্গ ? অন্তর্বর্তী আর অন্তবর্তী কি এক হল ? একটা যে ভিতরে, আরেকটা যে শেষে !

টুম্পি চমকে উঠে বলে : শেষ যে দুটো শব্দ বললে, তার কোনোটাতে তো বিসর্গ নেই। তবে কেন বললে ?

নেই ? আছে তো। অন্তঃ বর্তী সন্ধি করে হল না অন্তর্বর্তী ?

একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইল টুম্পি। কিন্তু নন্তু রইল গোঁ ধরে। বলল : 'আনন্দমেলা'র ধারাবাহিক লেখাগুলিতে দেখো লেখা থাকে 'ক্রমশ'। কেন ? তাহলে 'ক্রমশঃ' লিখবে না কেন ? বিসর্গ যদি না-ই তোলা যাবে ?

এইটেই হল ব্যাপার। কেবল ক্রমশ কেন, এ-রকম আরো অনেক শব্দ পাবি। যেমন ধর্, স্বভাবত বিশেষত অন্তত উভয়ত স্বত্ এর সবকটারই শেষে আছে 'তস্' বা 'তঃ'। কিন্তু শেষে আছে বলেই বাঙলায় এখন আর এর ব্যবহার না করলেও চলে। মনঃ আর কে বলছে বল্, মনটাই এখন বাঙলা শব্দ। তেমনি সদ্য, ছন্দ, যশ, পুন.....

পুন ? পুনঃপুনঃ-র কথা বলছ তুমি ? পুন আবার কেউ লেখে না কি ?

লেখে না ? কাব্যবিশারদ, এইবার তো হেরে গেলে তুমি ! শুনিসনি রবীন্দ্রনাথের গানে : আসিবে ফাল্গুন পুন, তখন আবার শুনো।

ও তো মেলাবার জন্যে।

কেবলই মেলাবার জন্যে নয়, বাঙলা-বাঙলা শোনাবার জন্যেও বটে। শব্দের শেষে অতবড় একটা বিসর্গের ধাক্কা দেব, অত কি জোর আমাদের ফুসফুসে আছে ? তাই একটু সহজ করে নেওয়া। নিলে দোষ নেই, যদি মনে রাখি যে শব্দগুলির মূলে একটা বিসর্গ ছিল।

কেন ? তুলেই যদি দিলে তবে আর মনে রাখবার দরকার কেন ?

দরকার একটু আছে। তা নইলে কেউ-কেউ ভাবতে শুরু করে যে এত তত ফত শব্দগুলির ত যে-রকম, বস্তুত অন্তত স্বভাবত-র ত-ও তেমনি।

ভাবলেই বা !

ভাবলেই বা ? তখন কী হয় জানিস না ? কেউ কেউ যেমন এতো লেখে, তেমনি লিখে বসে অন্ততো। সে এক দুঃসহ ব্যাপার। আবার অন্য দু-চারজন বিসর্গটাকে এমনই শিখে ফেলেছে যে 'হয়তো'কে লেখে হয়তঃ।

টুম্পি খিলখিল করে উঠল। বলল : যাঃ, এটা কাকু বানাচ্ছে।

না রে, এর বিন্দুবিসর্গও বানানো নয়। সবই যে আমার চোখে দেখা। আরো কত কাণ্ড হয় এ নিয়ে। আচ্ছা বলব আবার পরে।

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
জলের উপরে তেল ভাসছে! স্টীমারটা তাহলে এদিক দিয়েই গেছে!
জেনারেল ফার্নান্ডেজ এই জঙ্গল আর মশার রাজ্যে কেন এসেছে? জেনকে মেরে ফেলেনি তো?
বুনো হাঁসের কাঁচা ডিম খেয়ে বেঁচে আছে টারজান............জল-জঙ্গল ভেঙে করে এগোচ্ছে........
বন্দুকের শব্দ! কী হল?
দুম! দুম!
স্টীমার চুরমার! কী ব্যাপার? সৈন্যরা কাকে গুলি করছে?
প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ! স্টীমারের উপরে হানা দিয়েছে!
দুম!
সৈন্যরা ব্যস্ত! এই ফাঁকে জেন আর ক্যাপটেন আমেদকে খুঁজে বার করব!
দে, ওর মুখে মেয়েটাকে ছুঁড়ে দে!
জেন!
ক্যাপটেনকেও ছুঁড়ে দে!
বাঁচাও!

বাঁচাও!

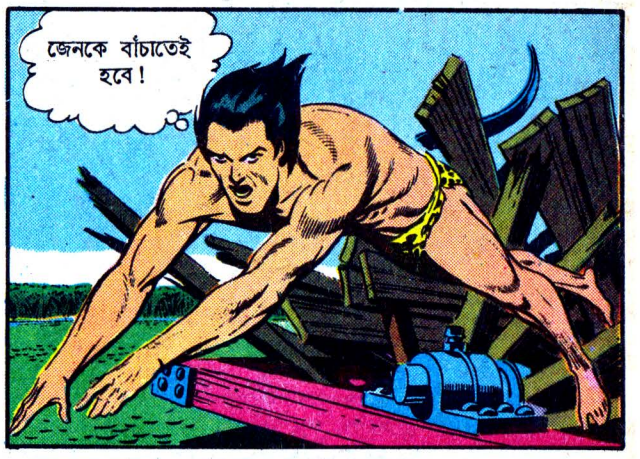
জেনকে বাঁচাতেই হবে!

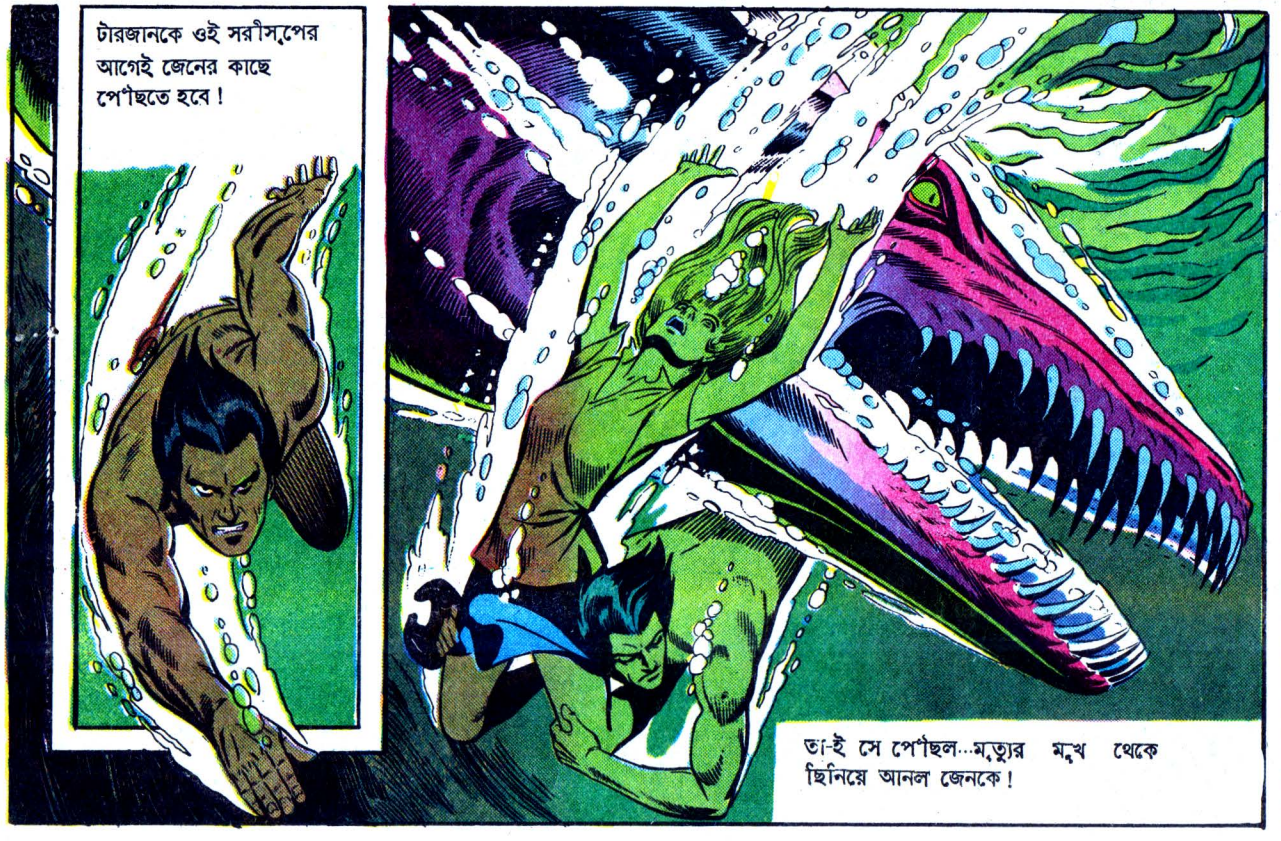
টারজানকে ওই সরীসৃপের আগেই জেনের কাছে পৌঁছতে হবে!
তা-ই সে পৌঁছল...মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনল জেনকে!

বিশাল সরীসৃপ টাইলোসরাস হতভম্ব! সেই ফাঁকে স্টীমারের হালের পিছনে লুকিয়েছে টারজান আর জেন!

কিন্তু এভাবে কতক্ষণ বাঁচা যাবে? কাছেই রয়েছে সেই বিশাল সরীসৃপ!

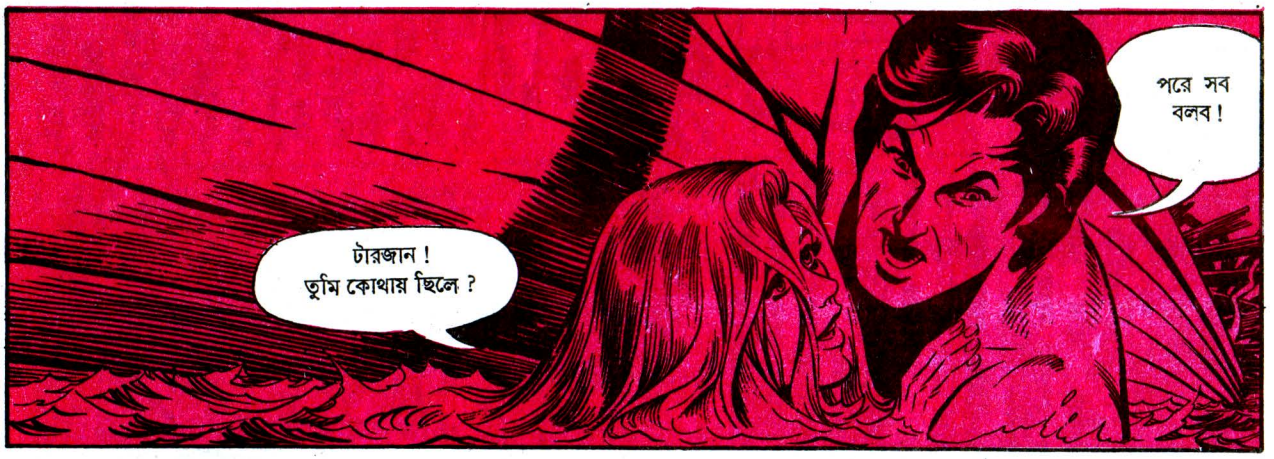


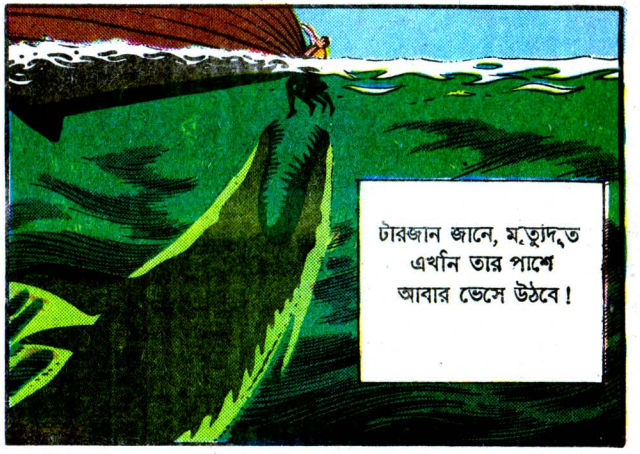


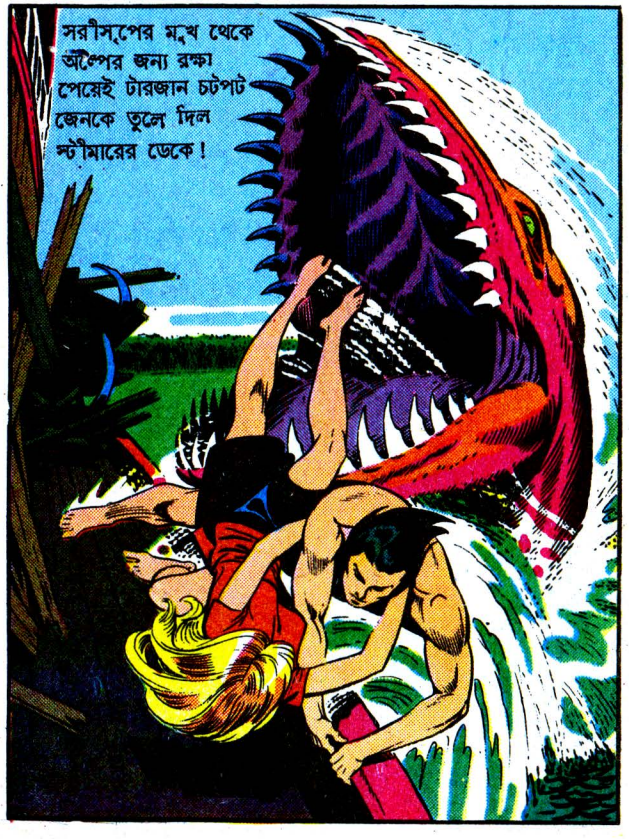

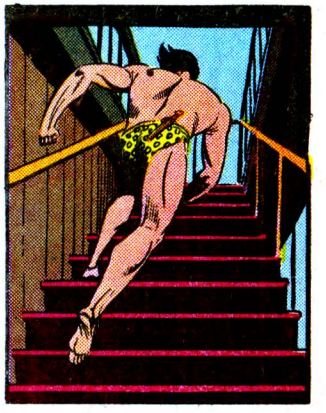

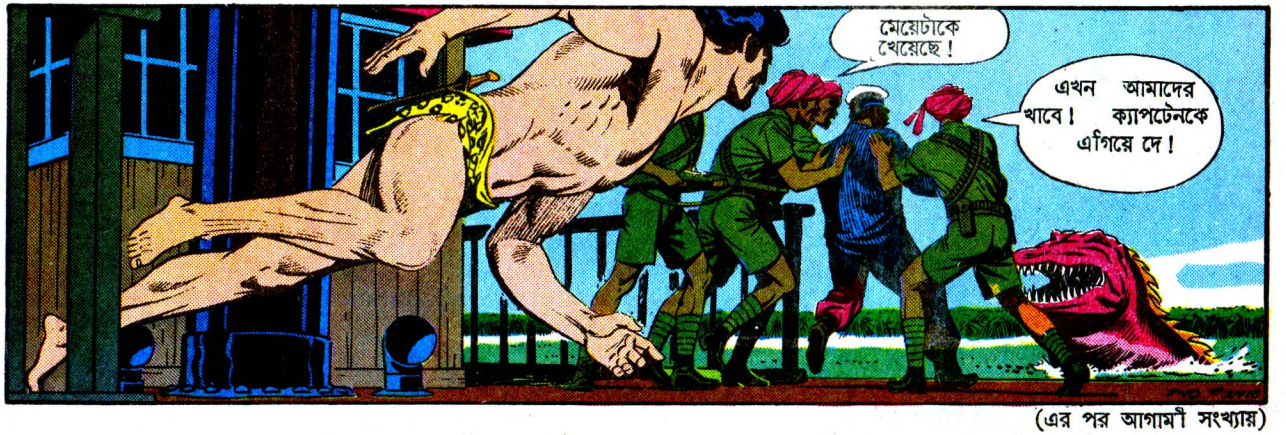


(এর পর আগামী সংখ্যায়)

## আটখানা

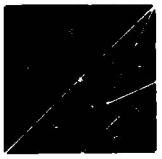

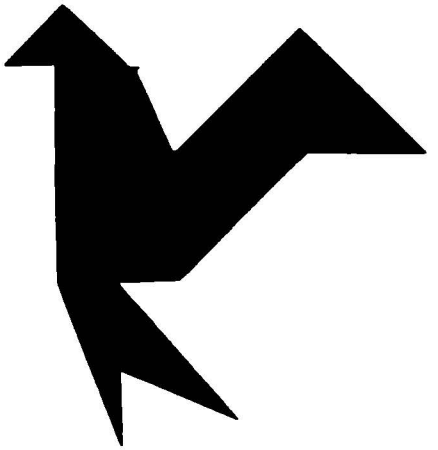

আগে অনেকেই মুর্গিকে লড়াই করতে শেখাত। লড়াই শেখাবার পরে তাদের নিয়ে যেত বিভিন্ন জায়গায় অন্য মোরগ কিংবা মুর্গির সঙ্গে লড়াই করাতে। তা দেখার জন্যে বহু লোক ভিড় করত, আবার কেউ কেউ খেলায় হারজিত নিয়ে বাজিও ধরত। সেসব লড়াই যদি তোমরা দেখতে তবে বুঝতে পারতে; এক-একটা মোরগ রাগে কেমন ফুলে ওঠে আর সে কী তেজ তাদের তখন! ওদের পায়ে অনেক সময় আবার ছুরিও বেঁধে দেওয়া হত। সেই ছুরির আঘাতে জখম হত প্রতিপক্ষ, মারাও যেত কখনো-কখনো। এখনও এ-ধরনের লড়াই কোনো কোনো মেলাতে দেখা যায়। এবারের আট টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেই লড়াকু মোরগের আক্রমণ করার বিশেষ এক ভঙ্গি। দেখো, তোমরা চেষ্টা করে তৈরী করতে পার কি না! সমাধান তো আছেই আগামী সংখ্যায়।

গতবারের সমাধান

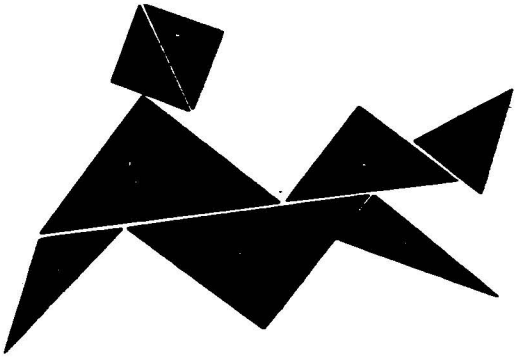

অসিত পাল

## ধাঁধা

"এবারে যাদের নিয়ে প্রথম ধাঁধা তারা সকলেই গৌরীর বন্ধু।" ছোটকা বলল, "গৌরীর এবারের ধাঁধাটাও বেশ মজার। তোর মনে আছে, একবার ফার্স্ট-সেকেন্ড কোন্ মেয়ে—এই নিয়ে গৌরী কী সাংঘাতিক একটা ধাঁধা পাঠিয়েছিল?"

আমার মনেই ছিল। সত্যি সেই ধাঁধাটাও দারুণ। খামে করে পাঠানো গৌরীর সেই ধাঁধাটা বেরিয়েছিল পৌষ মাসে। বাঁধানো আনন্দমেলা খুলে ছোট্কাকে চট করে দেখাতে তাই কোনো অসুবিধেই হল না।

পুরনো ধাঁধাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল ছোট্কা। তারপর বলতে শুরু করল।

অমলা, কমলা, নমিতা, শমিতা, দোলন, বুলন। মোট ছ-জন মেয়েকে নিয়ে এই ধাঁধা। এরা কফি হাউসে যায়।

সেদিন অমলা আর কমলা পরেছে শালোয়ার-কামিজ, নমিত-শমিতা ম্যাকসি, দোলন-বুলন শাড়ি।

অমলা নমিতা দোলন বেশ লম্বা। কমলা শমিতা বুলন একটু ছোটখাট্ট চেহারার। এদের মধ্যে আবার আড়ির ব্যাপার আছে। অমলার সঙ্গে নমিতার, কমলার সঙ্গে শমিতার এবং দোলনের সঙ্গে বুলনের আড়ি, অর্থাৎ কথাবন্ধ চলছে।

এদের মধ্যে দুটি ছোটখাট চেহারার মেয়ে ও একটি লম্বা মেয়ে একসঙ্গে বসে কফি খাচ্ছে একটি টেবিলে। দারুণ গল্প করছে সবাই। প্রত্যেকের পোশাক আলাদা। শুধু এইটুকু জেনে বলতে হবে, কোন্ তিনজন এই টেবিলে বসে কফি খাচ্ছে?

আরেকটি টেবিলে শালোয়ার-কামিজ পরা একটি মেয়ে ম্যাকসি-পরা একটি মেয়ের সঙ্গে বসে কফি খাচ্ছে আর খুব নিচু গলায় গল্প করছে। এদের দুজনই বা কে কে?

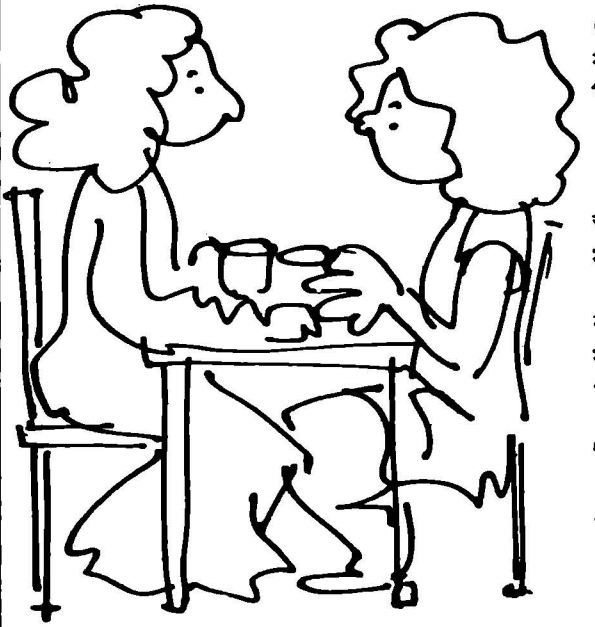

আধঘণ্টা বাদে চারটি মে কফি হাউস থেকে। দুটি মেয়ে বসে। এদের মধ্যে ভাব নেই দু-জনেরই পোশাক হুবহু এক হতে পারে?

এটাই এবারের প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ঃ দুটি গ্লাস জল, অন্যটিতে সমান পরিমা থেকে এক-চামচ দুধ তুলে নি নেড়ে মিশিয়ে দেওয়া হল। এ আবার এক-চামচ মিশ্রিত দু গ্লাসে ঢেলে দেওয়া হল। ক গ্লাসে জলের পরিমাণ বেশি ন পরিমাণ?

তৃতীয় ধাঁধা ঃ একজনের ব ৩। বয়সের বাঁদিকের রাশিটিকে বর্গফল করলে তার পুরে পাওয়া যাবে। তার বয়স কত?

চতুর্থ ধাঁধা ঃ কোন্ সংখ্যা

● ৮, ২৭, ৬৪, ৭২, ১০

গতবারের উত্তর ঃ (১) ১ আরম্ভ ও শেষ রাশি মাত্র দু-ঘ সুতরাং দ্বিতীয় ও চতুর্থ রা চতুর্থ রাশি ৫ থেকে ৬ হতে রাশিটি ০, ১, ২ এরকম হবে যাচ্ছে ১১০ মাইল যেতে হয় পক্ষে যাবার মতো গতি।

(২) দু-জনে আলাদা বছর দিনে।

(৩) ৬৫। অন্য সংখ্যায় পুরি ভাগ করা যায়।

(৪) গ ৬৩।

**সত্যসন্ধ**

ছবি/অহিভূষণ মালিক

; মেয়ে উঠে বেরিয়ে গেল
মেয়ে দ্বটি টেবিলে ছিটিয়ে
েই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু
ক। এই দ্বজনই বা কে-কে

।

প্লাস। একটিতে আধ প্লাস
রিমাণ দ্বধ। দ্বধের প্লাস
া নিয়ে অন্য প্লাসে ঢেলে
এই মেশানো প্লাস থেকে
তরল পদার্থ তুলে দ্বধের
বলতে পার, এখন দ্বধের
শ না জলের গ্লাসে দ্বধের



র বয়সের শেষ রাশিটি হল
টিকে অর্থাৎ প্রথম রাশিটির
বয়স উল্টোনো অবস্থায়
ত ?
খ্যাটি বেমানান ?
১০০০, ৭২৯
) ১৫৯৫১ এই সংখ্যাটির
দ্ব-ঘন্টায় বদলাতে পারে না।
রাশি বদলাবে। দ্বিতীয় ও
হতে পারে. সেক্ষেত্রে মধ্যের
হবে। ১৬০৬১ ধরলে দেখা
হয় দ্ব-ঘন্টায়। এটাই কম

বছরে জন্মেছে। কিন্তু একই

খ্যাগ্বলোকে ৭ দিয়ে প্বরো-

## কিসের ফটো

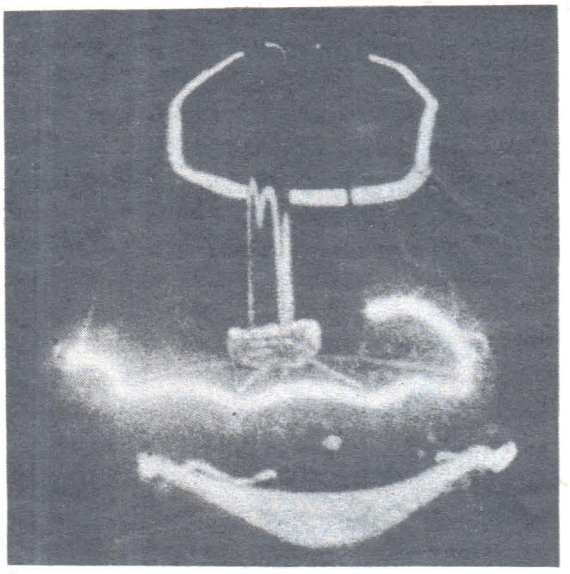



উত্তর আগামী সংখ্যায়/ফটো : তপন দাশ

গতবারে ছিল গাছের ডালে বৃষ্টির ফোঁটা

## কিসের ছবি

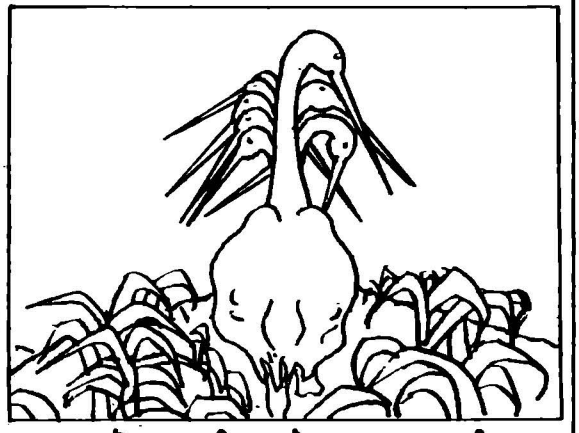



প্রথমেই বলে রাখি এটা কোন গাছের ছবি নয়। একটু ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবে এ হল এক পা-তুলে-রাখা একটা বক। ভাবছ, ওমা, বকের আবার এতগ্বলো মাথা হল কী করে। বক তো আর রাবণ নয় যে দশটা মাথা থাকবে। এই বকটার সত্যিই অতগ্বলো মাথা নেই। ব্যাপারটার সবটাই নির্ভর করছে দেখার ওপর। জানো তো বকেরা মাঝেমধ্যে সার বেঁধে এক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। একদম পাশ থেকে ভাল ভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, একটাই বক। অন্যান্য বকগ্বলো প্রথম বকটার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু দেখবে, ওদের অনেকেই এদিক-ওদিক মাথা নাড়াচ্ছে, কেউ বা ঠোঁট দিয়ে গা চুলকোচ্ছে। তাই মনে হচ্ছে একটা বকের অনেকগ্বলো মাথা।

**চিত্রপাল**

## শব্দ-সন্ধান

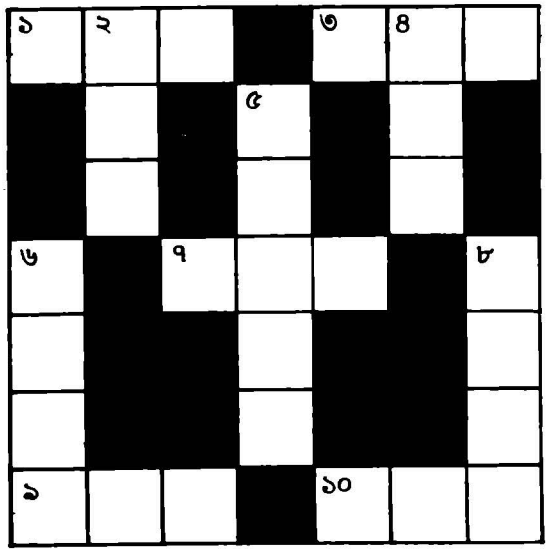

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | | ■ | ৩ | ৪ | |
| ■ | | ■ | ৫ | ■ | | ■ |
| ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| ৬ | ■ | ৭ | | | ■ | ৮ |
| | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| ৯ | | | ■ | ১০ | | |

এবারে দেওয়া হল রাজধানী-শব্দসন্ধান। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে মোট ১০টির রাজধানী দিয়ে এই ছক প্বরণ করতে হবে। সংকেত না-থাকলেও পারা যায়--তব্ব দেওয়া থাকল।

**সংকেত : পাশাপাশি :** (১) রাজার প্রতিশব্দ। (৩) মাছের নামও শোনা যায়। (৭) আগে রাজ্যের নামও এই ছিল, এখন অন্য। (৯) প্রথম দ্বটি অক্ষর জায়গা-বদল করলেই বিখ্যাত শৈলশহর। (১০) নাচের জন্যে বিখ্যাত এক রাজ্যের রাজধানী।

**উপর-নীচ :** (২) অতীতে মগধের রাজধানী ছিল, এখন নাম পালটে গেছে। (৪) গানবাজনায় আর চিকনের কাজে প্রসিদ্ধ। (৫) দাক্ষিণাত্যের এক রাজধানী। (৬) মলয়ালমভাষী রাজ্যের রাজধানী। (৮) ইংরেজীর সঙ্গে বাংলা শব্দের সমাস হলেই কান্না।

**সমাধান আগামী সংখ্যায়**

**গতবারের সমাধান**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ শ | কু | ন্ত | লা | ■ | ■ | ২ অ |
| মী | ■ | ■ | ■ | ৩ অ | ■ | ম্বি |
| ৪ ক | র্ণ | ■ | ৫ অ | ম্বা | লি | কা |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ৬ অ | ভি | ৭ ম | ন্যু | ■ | ৮ শি | ৯ বি |
| র্জু | ■ | য় | ■ | ■ | ■ | দু |
| ন | ■ | ■ | ১০ প | রা | শ | র |

টিনটিন ঠিকই বলেছে, এ-লোকটার দোষ নেই। একে ছেড়ে দাও। এ বরং আমাদের জন্যে কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আসুক।

তোমাকে ছেড়ে দিলুম। তোমার মালিকদের হাতে এই হাতকড়া পরাব।

যাও নেস্টর, কিছু চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নিয়ে এসো।

কিন্তু ক্যাপটেন, তুমি এখানে এলে কী করে?
বলছি, বলছি।

তোমার ফোনের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝিনি। তারপরেই হাসপাতাল থেকে একটা ফোন আসে...

আহত লোকটি সুস্থ হয়ে জানায় যে, মার্লিনস্পাইকের বার্ড-ব্রাদার্স তাকে গুলি করেছিল। বাস্, তখুনি তোমার ফোনের মর্ম আমি বুঝতে পারি।

তখন তো আর নষ্ট করবার মতো সময় নেই। পুলিসকে চটপট খবর দিয়ে আমি এখানে চলে আসি।

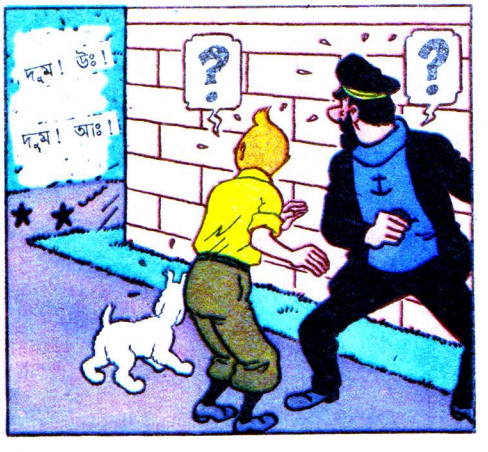
দুম! উঃ!
দুম! আঃ!

বদমাস দুটোকে পুলিসের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে আসা আমাদের উচিত হয়নি।

দ্যাখো! ওই একজন পালাচ্ছে! ওই মোড় ঘুরল!

ওটাই সবচেয়ে পাজী! পালাতে না পারে!

একটা গাড়ি! স্টার্ট নিচ্ছে!
ব্রররর
ব্রররর

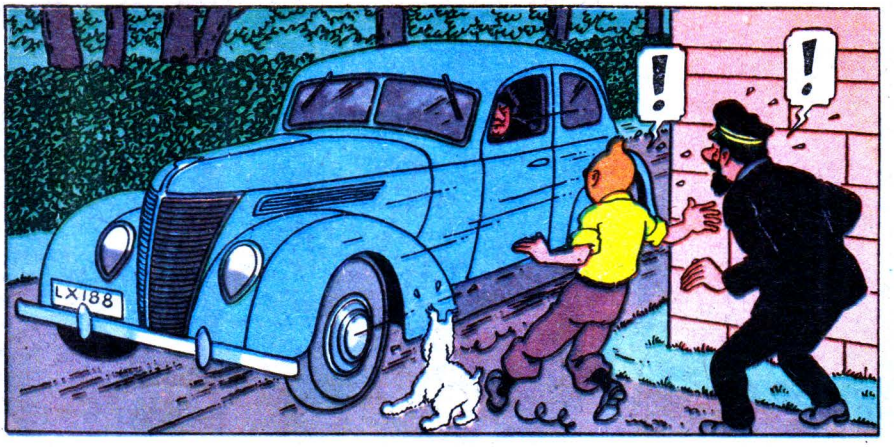

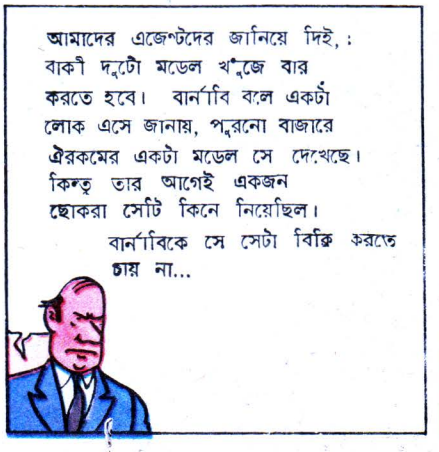

(এরপর চৌত্রিশের পাতায়)

# এঁদের নিয়ে কসমস

ক্লাইভ টোয়ি (প্রেসিডেন্ট)

মাইক মার্টিন (জেনারেল ম্যানেজার)

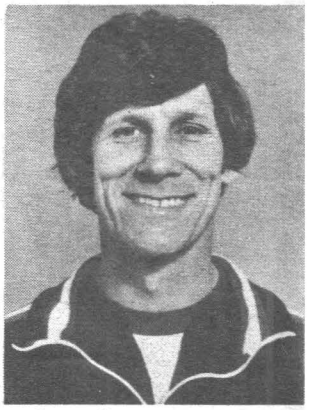


গর্ডন ব্রাডলি (হেড কোচ)

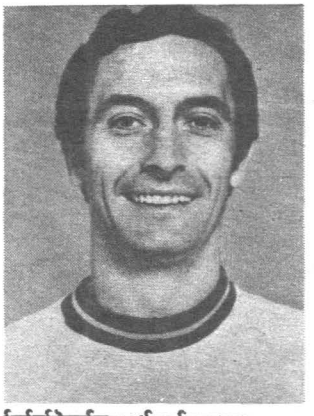


ডিমিট্রিজেভিক (মিডফিল্ডার)

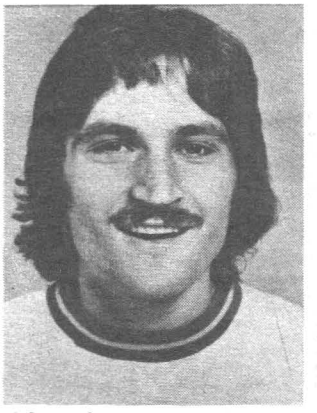


টোনি ডনলিক (ফরোয়ার্ড)

পেলে (ফরোয়ার্ড)

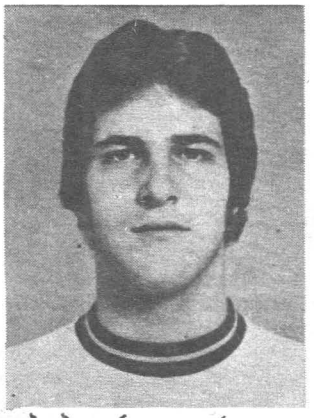


স্কট স্ট্রাসবুর্গ (ফরোয়ার্ড)

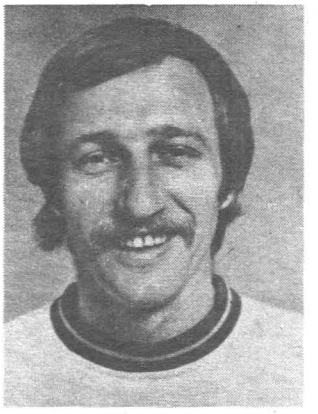


জাদরেঙ্কো টপিক (ফরোয়ার্ড)

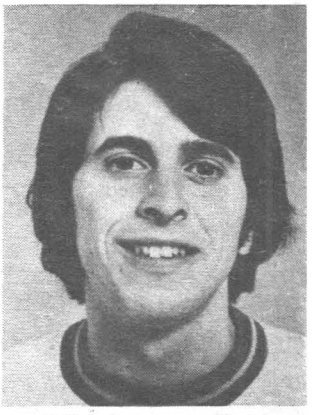


ব্রুস টৌমলি (ডিফেন্ডার)

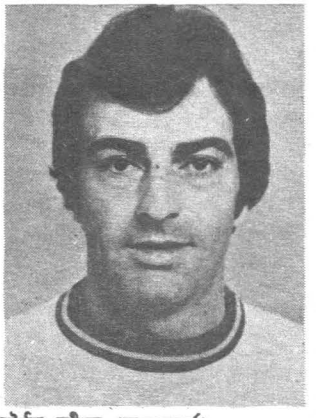


টোনি ফীল্ড (ফরোয়ার্ড)

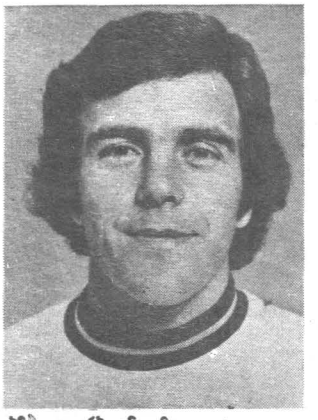


টোমি গার্বেট (মিডফিল্ডার)

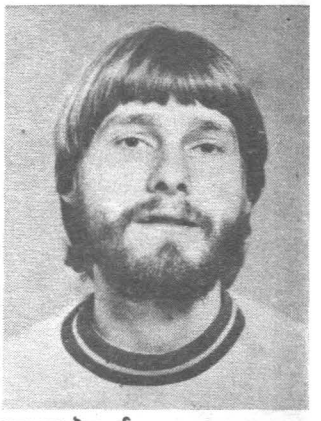


পল হান্টার (ডিফেন্ডার)

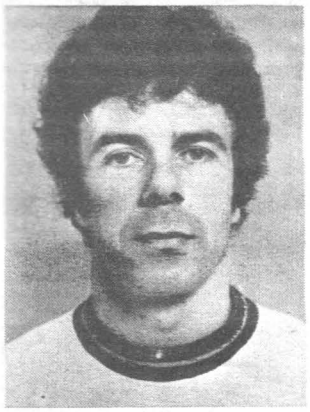

চার্লি আইটকেন (ডিফেন্ডার)

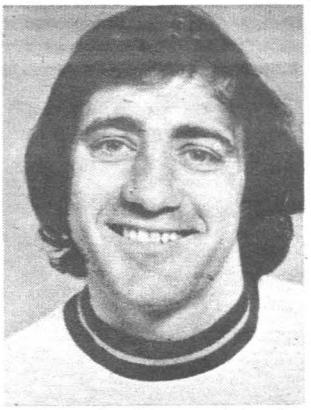

জিওর্জিও চিনাগ্লিয়া (ফরোয়ার্ড)

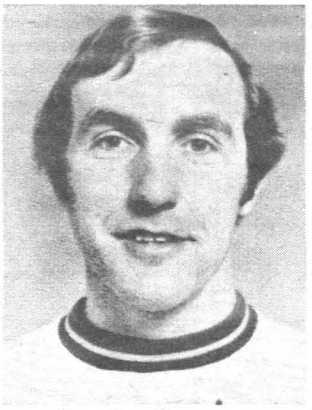

ডেভ্ ক্লিমেন্টস (মিডফিল্ডার)

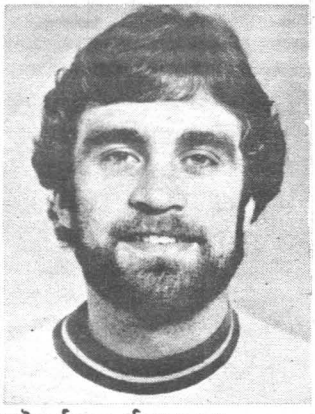

মাইক ডিলন (ডিফেন্ডার)

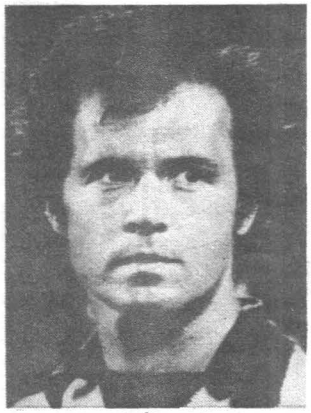

ফ্রানৎস বেকেনবাউয়ার (মিডফিল্ডার)

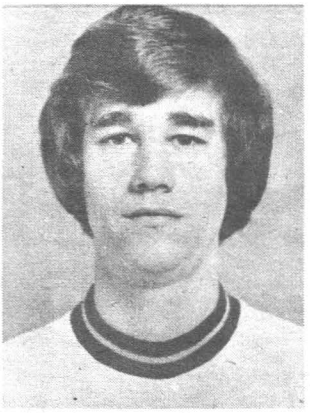

বব রবসন (ফরোয়ার্ড)

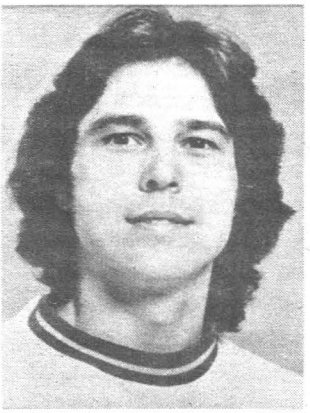

ওয়েন্ডার রথ (ডিফেন্ডার)

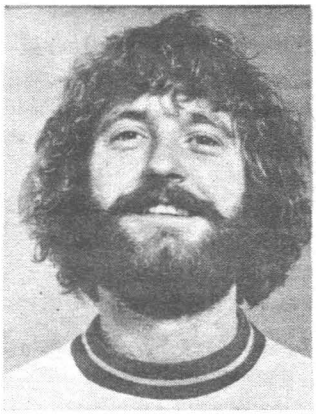

বব স্মিথ (ডিফেন্ডার)

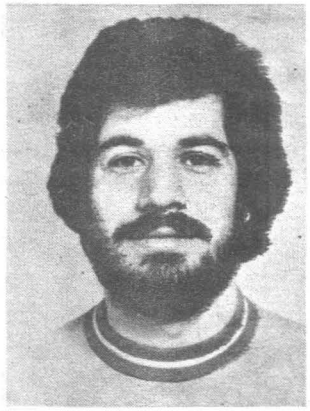

এরল ইয়াসিন (গোলকীপার)

জুলিও মাজুজি (সহকারী কোচ)

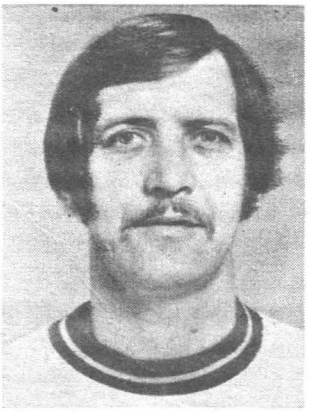

কীথ এড্ডি (ডিফেন্ডার)

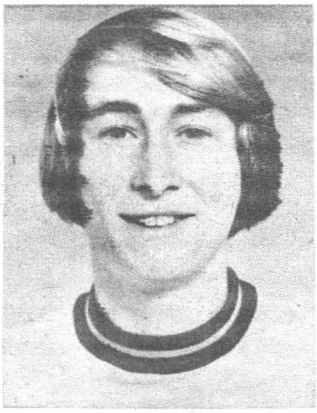

গ্যারি এথারিংটন (ফরোয়ার্ড)

জো ম্যালেট (সহকারী কোচ)

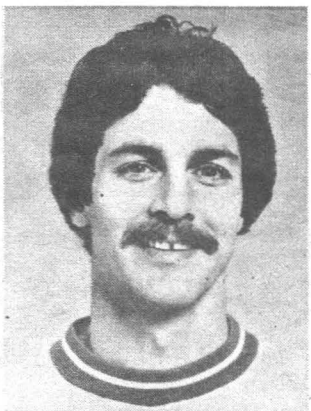

শেফ মেসিং (গোলকীপার)

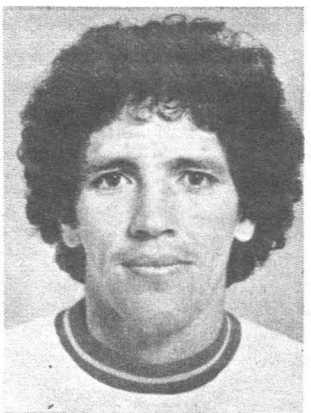

র‍্যামন মিফলিন (মিডফিল্ডার)

নেলসি মোরেস (মিডফিল্ডার)

(একত্রিশের পাতার পর)

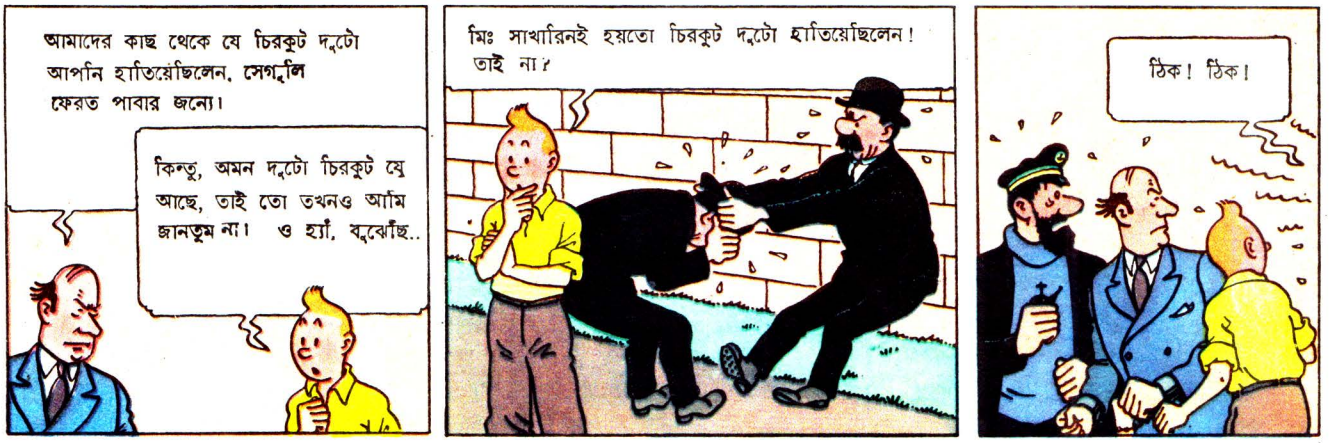


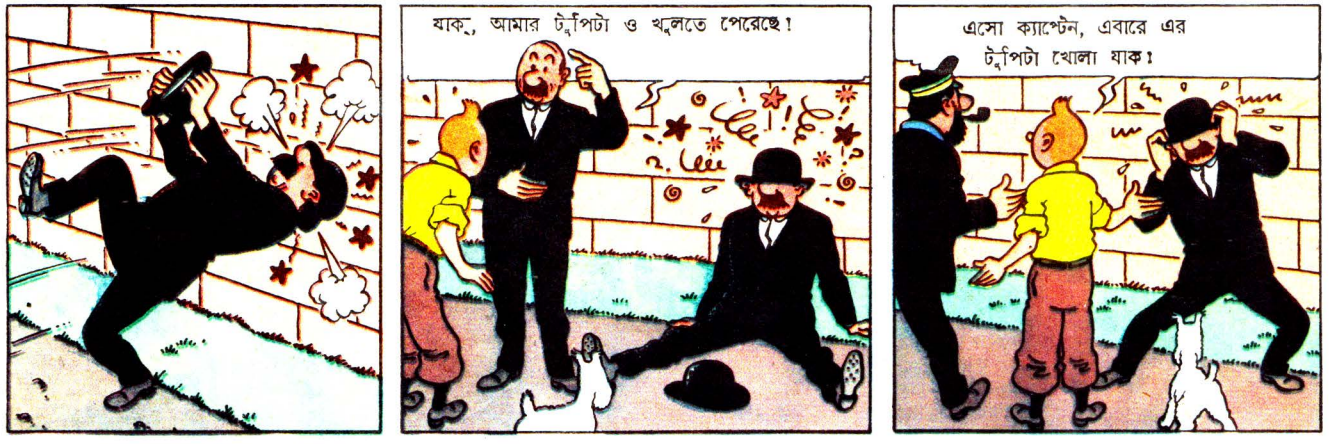

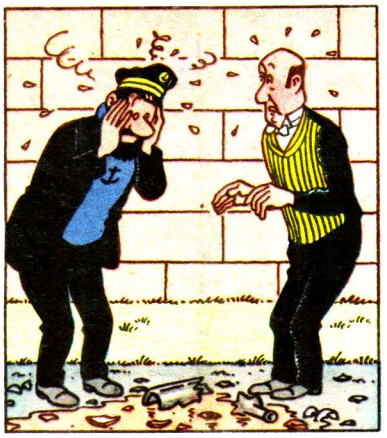

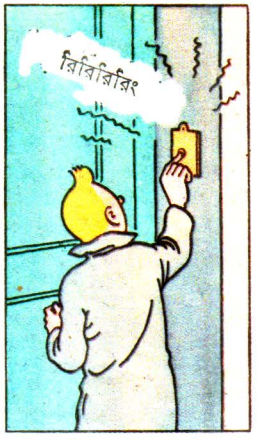

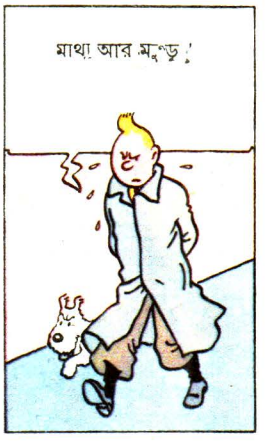

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

## সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটি

আমাদের কলকাতার বাড়ির ঠিক সামনে রাস্তার ধারে আছে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। কলকাতার রাস্তার ধুলো, ধোঁয়া, হৈ-হৈ রৈ-রৈ-এর মধ্যে একধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা এই গাছটাকে দেখে আমার শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ে যায়। একবার শীতকালে কলকাতা গিয়ে দেখি, গাছটার সব পাতা ঝরে গেছে, শুধু শুকনো ডালগুলো আকাশের দিকে চেয়ে আছে। গাছটাকে দেখে আমার সেবার খুব কষ্ট হয়েছিল। মনে হয়েছিল—ও আমারই মত। কলকাতার ধুলো ময়লা আমার মত ওরও সহ্য হয় না। প্রত্যেকবার শান্তি-নিকেতন থেকে কলকাতায় এলে আমার যেমন অসুখ করে—আর একা একা আমাকে শুয়ে থাকতে হয়—কিংবা গলায় মাফলার, পায়ে চটি দিয়ে চুপ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি রোগা হয়ে যাই—তেমনি করে এই গাছটাও শুকিয়ে গেছে। পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে গিয়ে দেখি গাছটা আবার ফুলে ফুলে ভর্তি হয়ে গেছে, যেন প্রত্যেক ডালে আগুন লেগেছে। আমি যেমন নিজের অজান্তেই লম্বা হয়ে যাই, আগের বছরের জামাগুলো পরের বছর পরতে গিয়ে অবাক হই, তেমনি করে গাছটা কখন নিজের অজান্তেই ভরে উঠেছে।

কলকাতায় আমার কোন খেলার সঙ্গী নেই। গরমের ছুটির বিরাট দুপুরগুলোয় বাড়ির বড়োরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েন, তখন আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরের সেই গাছটাকে খেলার সঙ্গী করে নিই। মাঝে মাঝে কোনও বিকেলে গাছটার ওপর কালো মেঘ জমে, কৃষ্ণচূড়ার রঙ হয় গাঢ় লাল। তখন কেবল মনে পড়ে ঠাকুরমার ঘরে টাঙানো ক্যালেন্ডারের ছবিটার কথা—মনে হয় সমস্ত আকাশ জুড়ে ঠিক সেইরকম এক মা কালী যেন তাঁর টকটকে লাল জিভ বার করে দাঁড়িয়ে আছেন।

কৌশিক মুখোপাধ্যায় (বয়স—৮)

## ভূতের ভয়

আমার বন্ধুর নাম মিতা। মিতা একদিন আমাকে একটা ভূতের গল্প বলেছিল। তারপর আমি একদিন যখন রাত্তিরে ঘরে বসে পড়ছি তখন টেবিলের তলায় ঘড় ঘড় করে আওয়াজ হল। আমি ভয় পেয়ে দৌড়ে মায়ের কাছে গেলাম। মা শুনে বললেন, ইঁদুরে শব্দ করছে। কিন্তু আমার কিছুতেই ভয় গেল না।

সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায় (বয়স—৮)

## তাঁবুর বাইরে বাঘ

আমার বাবা জঙ্গলে তাঁবু ফেলে সারভে করতেন। সেই জঙ্গল এত গভীর যে, সেখানে বাঘ, ভাল্লুক ও নানা ধরনের বুনো পশু বাস করত। একদিন রাতের বেলা বাবা তাঁবুর বাইরে খচখচ শব্দ শুনেছিলেন। তখন তিনি আর ওঠেননি, পরদিন সকালবেলা উঠে দেখেন, তাঁবুর চারধারে বাঘের থাবা। ভাগ্যিস বাঘটা তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে পারেনি!

অনিন্দ্য ঘোষ (বয়স—৬)

## মুখের মধ্যে লিচু

আমাদের স্কুলে একটা লিচু গাছ ছিল। একদিন আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ে টিফিনের সময় লিচু পাড়ছিল গাছে চেপে। হঠাৎ গাছ থেকে পড়ে গিয়ে তার হাত ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই তার কাছে ছুটে গেলাম। দিদিমণিরা, এমন কী বড়দি পর্যন্ত ছুটে এলেন। একটু পরে অ্যাম্বুলেন্সও এসে গেল। মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। মেয়েটা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। কিন্তু সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, ওকে যখন অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল, তখন দেখা গেল ওর মুখের মধ্যে একটা লিচু। ও কাঁদতে কাঁদতে দিব্যি খেয়ে যাচ্ছিল লিচুটা।

অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (বয়স—১২)

## একদিন

একদিন একটা মেয়ে পথের ধার দিয়ে যাচ্ছিল। তখন দুপুর তিনটে। রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। হঠাৎ মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল। লোকেরা ছুটে এল, দেখল একটা সাপ। তারপর তারা সাপটাকে মেরে ফেলল। মেয়েটা তখন হাসতে হাসতে চলে যাবার আগে ওদের বলল, 'ধন্যবাদ'।

অনুরাধা ঘোষ (বয়স—৭)

## বর্ষা

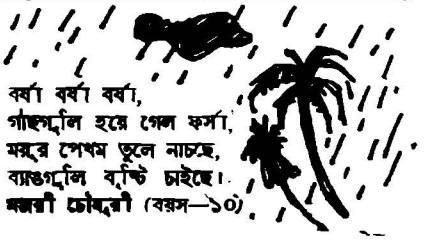



বর্ষা বর্ষা বর্ষা,
গাছগুলি হয়ে গেল ফর্সা,
ময়ূর পেখম তুলে নাচছে,
ব্যাঙগুলি বৃষ্টি চাইছে।

মঞ্জরী চৌধুরী (বয়স—১০)

## বর্ষাকাল

বর্ষাকালে কী ঝামেলা
রাস্তা ঘাটে যায় না চলা
সর্দি কাশি লেগেই আছে
সবারই ভয় জ্বর হয় পাছে
কিন্তু এটা সত্যি জেনো
বর্ষা ছাড়া ফসল কোনো
হয় না মাঠে খাবার তরে
ফল মূল সব মাটির পরে॥

শ্রাবণী সোম (বয়স—৯)

## উলটো রাজার দেশে

উলটো রাজার দেশে সবাই
চড়ে উলটো গাধায়।
পায়ের ওপর টুপি পরে,
জুতো পরে মাথায়।
সূর্য ওঠে রাত্রি বেলা
ভাঙিয়ে সবার ঘুম
দিনের চেয়ে রাত্তিরেতেই
কাজ করবার ধুম।

সায়ন ভট্টাচার্য (বয়স-৯)

## পুজো আসছে

বৃষ্টির দিন ফুরিয়ে গেল
পুজোর বেশি নেইতো বাকি,
আকাশজোড়া মেঘগুলো সব
দেবতাদের পোষা পাখি।

দুর্গাঠাকুর আসেন যদি
নদীর উপর নৌকো করে,
তবেই সারা জগৎ জুড়ে
বন্যা নামে দারুণ জোরে।

আবার যদি আসেন চড়ে
বিরাট বড় হাতিতে,
তখন লোকের ঘুম ভেঙে যায়
ঝড়ের মাতামাতিতে।

দুর্গাঠাকুর মর্তে এসে
দাঁড়ান যখন বেদীর পরে,
ছেলে-বুড়ো সবার তখন
মন যে আনন্দেতে ভরে।

সুমন্ত্র বসু (বয়স—৯)

ছবি এঁকেছে অর্পিতা গুপ্ত (বয়স ৬)

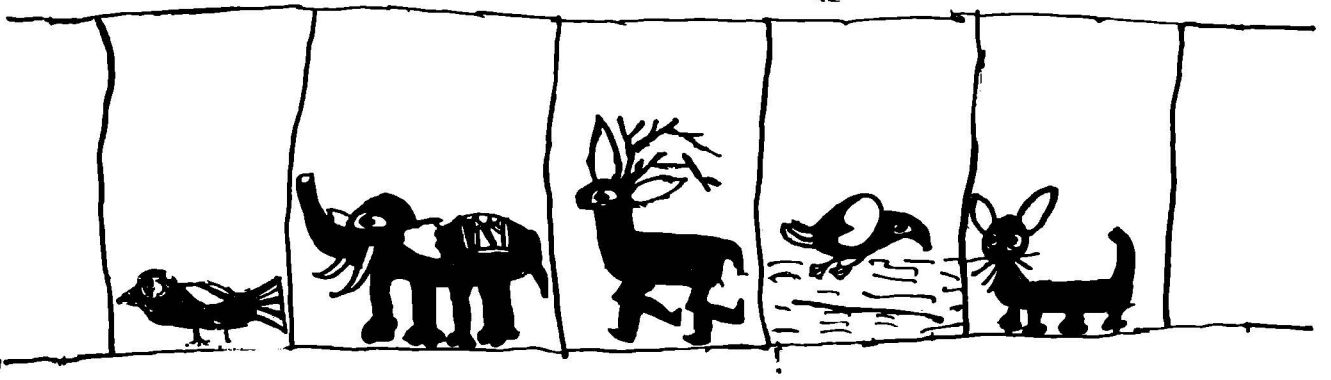

# বন্ধ ঘরের আওয়াজ

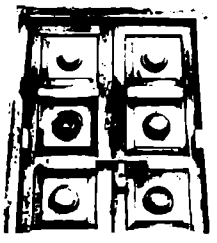

সমরেশ বসু

**আগে যা ঘটেছে**

গোগোল ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে শুনল, সাততলার ডাবুদা, যার ভাল নাম নবনীত, গতকাল সেই যে ইস্কুলে বেরিয়েছিল, তারপরে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। ওর খাবার সময়েই ওদের ফ্ল্যাটবাড়ির চত্বরে পুলিসের ওয়্যারলেস লাগানো জীপ আর দুজন অফিসারকে, ডাবুদার বাবার সঙ্গে আসতে দেখা গেল। কোনরকমে খাওয়া শেষ করে গোগোল ওদের পাঁচতলা থেকে সাততলায় যাবার জন্য লিফ্‌টের সামনে এসে দাঁড়াল। লিফ্‌ট তখন নীচে নামছে। লিফটের খাঁচার মধ্যে একজন অচেনা লোককে দেখা গেল, যাকে দেখে অনেকটা গাড়ির ড্রাইভারের মতো মনে হয়। গোগোল সিঁড়ি দিয়েই সাততলায় উঠল। সেখানে দেখা গেল, ডাবুদার দিদিরা—মীনাদি আর রিনাদি আর তাঁদের মা কাঁদছেন। গোগোল ভিতরে ঢুকে গেল। একটু পরেই সেখানে এলেন পারভেজের বাবা ইউসুফ সাহেব, অন্যান্য ফ্ল্যাটের নন্দলালবাবু, সীতারাম হনুমন্তিয়া। তাঁরা সকলেই পুলিস অফিসার দুজনের সঙ্গে নানারকম আলোচনা করতে লাগলেন। হনুমন্তিয়া খুব একটা সাংঘাতিক কথা বললেন, ডাবুদাকে হয়তো কোন বাজে লোক ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়েছে, এবার ডাবুদার বাবা নীহার-বাবুর কাছে মোটা টাকা চেয়ে পাঠাবে। না পেলে ডাবুদাকে মেরে ফেলবে। গোগোল এ সব খবর নীচে বন্ধুদের দেবার জন্যে ঘর থেকে বেরোবার মুখেই ওর বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাবা রাগ করবেন ভেবে মনটা খচ্‌খচ্‌ করলেও, ও তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ছ'তলায় মহেশানিদের বন্ধ দরজার ফ্ল্যাটে যেন কার চাপা গলার শব্দ, আর খস্‌ করে কিছু টেনে নেবার শব্দ শুনল। গোগোল নীচে নেমে এসে বন্ধুদের সব খবরই দিল। রাস্তার মোড়ে ব্যান্ডমাস্টারের রুকে ডাবুদার থেকে বেশ বড় পিলু আর জ্যাকির মতো বাজে ছেলের সঙ্গে ডাবুদা মিশত। কেন? পুলিস কি ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল? এই সব আলোচনার মাঝখানেই লিফ্‌টে করে পুলিস অফিসার দুজন আর ডাবুদার বাবা নেমে এসে গাড়িতে চেপে বেরিয়ে গেলেন। গোগোল দেখল ড্রাইভারের মতো দেখতে সেই অচেনা লোকটা আবার এসে লিফ্‌টে চেপে সোজা সাততলায় উঠে গেল। আর সেই মুহূর্তেই গোগোলের মনে পড়ে গেল, আশ্চর্য, ছ'তলার মহেশানি পরিবারের সবাই তো গত সপ্তাহে দিল্লি চলে গিয়েছেন! তাঁদের ফ্ল্যাট তো বন্ধ, কেউ নেই! গোগোল তবে কার চুপি-চুপি স্বর শুনেছে? তারপর—

8

মহেশানিদের লক করা ফ্ল্যাটে কেউ নেই, অথচ তার ভিতর থেকেই কার যেন চুপি চুপি স্বর শোনা গিয়েছিল, কথাটা মনে পড়তেই, গোগোল একেবারে কাঠ হয়ে গেল। ওকে ঘিরে যে টুকাই পারভেজ সুমিত গোগে জর্জ—সব বন্ধুরা বসে আছে। সে-কথাও যেন একেবারে ভুলেই গেল। ওর মনে একটা রীতিমত ধন্দ লেগে গেল, সত্যি কি ও মহেশানিদের বন্ধ দরজার ভিতরে কারো চুপিচুপি স্বর শুনেছিল? আর ধুপ্‌ করে কিছু পড়ে যাওয়ার, খস্‌ করে কিছু টেনে নেবার শব্দ? কিন্তু কী করে তা সম্ভব? এখনো গোগোলের চোখের সামনে ভাসছে, মহেশানি পরিবারের ছোট বড়, সকলের চোখে জল। দিল্লি থেকে তাঁদের বিশেষ কোন আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদ এসেছে, তাই গোটা পরিবার দিল্লি যাচ্ছেন। নীচে গাড়িতে তাঁদের মালপত্র তোলা হচ্ছে।

গোগোল ভুল শোনেনি তো?

ইতিমধ্যে গোগোলের বন্ধুরা সবাই মিলে ওর গায়ে ধাক্কা মারতে আরম্ভ করেছে। হাসাহাসি করে অনেক কিছু বলতে শুরু করেছে। গোগোল অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল লিফ্‌টের দরজার মাথার ওপরে ফ্লোর নাম্বারের দিকেই। যদিও সাত নম্বরটা তখন মুছে গিয়েছে। লিফ্‌ট নীচেও নেমে এসেছে, কারা যেন বেরিয়েও গেল ওর চোখের সামনে দিয়ে। আসলে ড্রাইভারের মতো দেখতে সেই লোকটাকে লিফ্‌টে উঠতে দেখার সময়েই মহেশানিদের বন্ধ দরজার কথা ওর মনে পড়ে গিয়েছিল। আর ওখান থেকে চোখ ফেরানো হয়নি, এমনই অবাক আর তন্ময় হয়ে গিয়েছে!

জর্জ গোগোলের থুতনিতে হাত দিয়ে বলল, "কী রে গোগোল, তুই কি লিফ্‌টের মধ্যে ডাবুদাকে দেখতে পেয়েছিস নাকি?"

টুকাই গোগোলের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে, তোকে ভূতে পেয়েছে।"

সবাই হেসে উঠল। পারভেজ বলল, "ভূত না, জিন!"

গোগে আর সুমিত গোগোলের দু কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে, চিৎকার করে ডাকল, "এই গোগোল!"

গোগোল চমকে উঠল! গোগে আর সুমিতের ঘাড়ে ধাক্কা বা চিৎকারের জন্য না। ওর মনে পড়ে গেল, গত সপ্তাহের শেষ বিকালে, গাড়িতে মহেশানিদের মালপত্র তোলার সময় ওর কাছে ছিল পারভেজ আর সুমিত। গোগোল বলল, "আচ্ছা পারভেজ, লাস্ট উইকে মহেশানিরা দিল্লি গেছে, তাই না?"

সুমিত জবাব দিল, "আমাদের সামনেই তো ওদের মালপত্র তোলা হল, ভুলে গেলি?"

জর্জ ওর বড় বড় দাঁতে হেসে বলল, "মহেশানিরা সব আনি আর দুয়ানি। তুই ওদের কথা ভাবছিস কেন?"

গোগে বলল, "গোগোল, তুই মহেশানিদের কথা ভাবছিস? আর আমি ভাবছি, তুই সত্যি লিফ্‌টের দিকে তাকিয়ে আছিস।"

গোগোল ভাবল, মহেশানিদের চলে যাবার বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। কিন্তু ছ' তলার সেই বন্ধ দরজার ভিতরে, সত্যি কি কিছু শোনা যায়নি? গোগোলের মন কিছুতেই মানছে না। মহেশানিদের বন্ধ দরজাটা ওকে চুম্বকের মতো টানতে লাগল। ও লিফ্‌টের দিকে তাকাল। লিফ্‌ট এখনো নীচে। ও মন স্থির করে এক লাফে উঠে দাঁড়াল, বন্ধুদের বলল, "তোরা বোস, আমি এখুনি আসছি।" বলেই দৌড়ে গিয়ে, দরজা খুলে লিফ্‌টে উঠল। দরজা বন্ধ করে, ছ' নম্বর বোতাম টিপে দিল।

লিফ্‌ট এসে ছ নম্বরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনই নীচের থেকে কেউ লিফ্‌টের বোতাম টিপল, বেল বেজে উঠল। গোগোল ঠিক মতো নেমে, লিফ্‌টের দরজা বন্ধ করে দিতেই, খাঁচা নেমে গেল। নীচের থেকে এখন ওপরে দিনের আলো বেশি। একটা ছাড়া, প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের দরজাই বন্ধ। যে-ফ্ল্যাটের দরজা খোলা, সেটা লাহিড়ীদের ফ্ল্যাট। ভিতর থেকে অনেকের কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। মহেশানিদের ফ্ল্যাটটা সিঁড়ির পাশেই, যে-কারণে গোগোলের হঠাৎ মনে হয়েছিল, ভিতর থেকে যেন কেউ চুপিচুপি স্বরে কথা বলে উঠল। সাততলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়েই ও যেন সেই শব্দ শুনেছিল।

লাহিড়ীদের ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরের দরজাটা খোলা। পর্দা ফেলা রয়েছে, কিন্তু বাইরের ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ ভেসে

# শিশুদের—কিশোরদের—যত ছোটদের বই

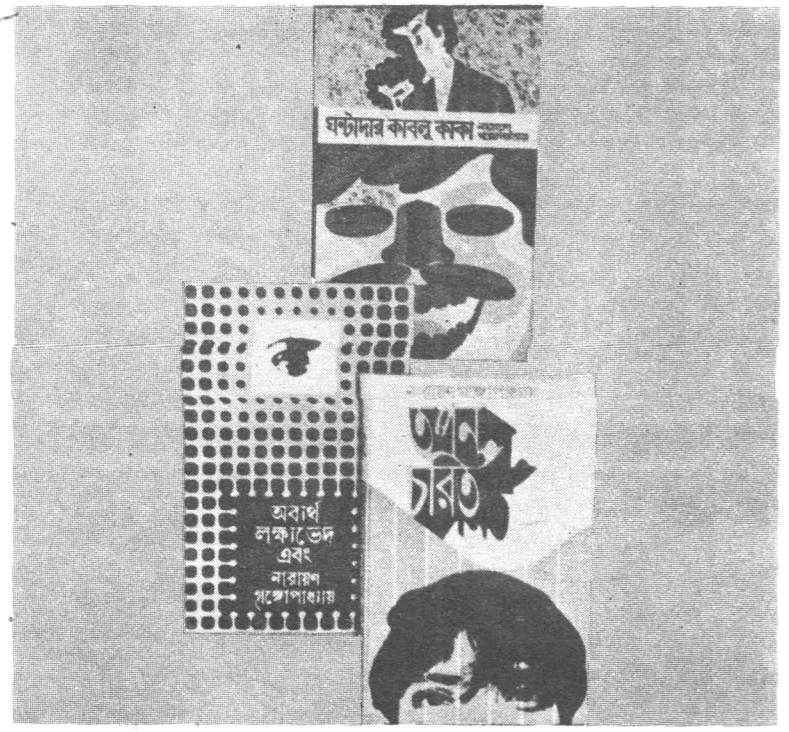


বড়দের লেখার সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের লেখায়ও সমান দক্ষতা দেখিয়ে উভয় শ্রেণীর পাঠকদের কাছেই অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর টেঁনিদা'কে বাঙালী কিশোর-কিশোরীরা বোধ হয় কোনও দিনই ভুলতে পারবে না। তাঁর কয়েকটি বই : ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫.০০ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬.০০ তপনচরিত ৫.০০

**শিবরাম চক্রবর্তী**
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪.০০
শিব্রামের বারো আড়ি ৫.০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৫.০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬.০০
**বিমল কর**
ওআণ্ডার মামা ৬.০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭.০০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩.০০
**গৌরকিশোর ঘোষ**
দুষ্টুর দুপুরে ৩.০০
**আনন্দ বাগচী**
বনের খাঁচায় ৫.০০
**পার্থসারথি চক্রবর্তী**
কৈমিক্যাল ম্যাজিক ৪.০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪.০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩.০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫.০০
**মৌমাছি ( বিমল ঘোষ )**
রাজার রাজা ৭.০০
**শৈলেন ঘোষ**
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩.০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪.০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬.০০
বাজনা ৫.০০
হুস্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫.০০
আমার নাম টায়রা ৫.০০

**শঙ্করীপ্রসাদ বসু**
আমাদের নিবেদিতা ৬.০০
**প্রেমেন্দ্র মিত্র**
আগ্রা যখন টলমল ৫.০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫.০০
**পাপু ( সুব্রত সরকার )**
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫.০০
পাপুর বই ৬.০০
**হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়**
ভয়ের মুখোশ ৫.০০
পাথরের চোখ ৬.০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬.০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬.০০
**শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪.০০
**ইন্দ্রমিত্র**
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫.০০
শরৎ কথামালা ১০.০০
**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়**
ভয়ংকর সুন্দর ৪.০০
দত্যি রাজপুত্র ৫.০০
তিন নম্বর চোখ ৫.০০
**মতি নন্দী**
ননীদা নট আউট ৪.০০
স্টাইকার ৬.০০
স্টপার ১০.০০
কোনি ৬.০০

**সমরজিৎ কর**
একটি সংকেতের জন্যে ৬.০০
**নারায়ণ চক্রবর্তী**
হলদে সবুজ কৃষ্ণচাল ১০.০০
**পূর্ণেন্দু পত্রী**
কী করে কলকাতা হলো ৪.০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪.০০
**বুদ্ধদেব গুহ**
ঝজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ ০০
ঝাঁকিদর্শন ৬.০০
**সুকুমার রায়**
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০.০০
জীবজন্তু ৮.০০
**সত্যজিৎ রায়**
বাদশাহী আংটি ৫.০০
এক ডজন গপ্পো ১০.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০
সোনার কেল্লা ৬.০০
বাক্স-রহস্য ৫.০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬.০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০
আরো এক ডজন ১০.০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬.০০
ফটিকচাঁদ ৮.০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮.০০
**সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার**
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২.০০
**সরলাবালা সরকার**
পিনকুর ডাইরি ৪.০০
**মনোজ বসু**
ওস্তাদ নটবর ৬.০০
**শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়**
ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪.০০
**লীলা মজুমদার**
বাতাসবাড়ি ৪.০০
**অমরনাথ রায়**
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০.০০
**আশাপূর্ণা দেবী**
রাজকুমারের পোশাকে ৪.০০
**সমরেশ বসু**
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫.০০
**অমিতাভ চৌধুরী**
তেপান্তরের মাঠে ৩.০০
**ননীগোপাল চক্রবর্তী**
চরকা বুড়ী ৪.০০
**গিরিবারী কুণ্ডু**
টংসা চু ৫.০০
**সুবোধ ঘোষ**
সেই অদ্ভুত অস্ত্রখনি ৫.০০
**বিমল মিত্র**
রাজা হওয়ার ঝকমারি ৭.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন।
কলকাতা-৭০০০০৯ ফোন ৩৪-৪৩৬২

আসছে। প্রত্যেকটা ফ্লোরে চারটে করে ফ্ল্যাট। লাহিড়ীদের পরেই কুণ্ডু, কুণ্ডুদের পরে সিন্‌হা। সিন্‌হারা অবাঙালী। মহেশানিরাও। গোগোল সব ফ্ল্যাটের প্রায় সবাইকেই চেনে। এই ফ্ল্যাটবাড়ির সবাই সবাইকেই চেনে, তবে গোগোলদের মতো ছোটদের সঙ্গে বড়দের বিশেষ কোন কথাবার্তা নেই। ওর সমবয়সী বা কাছাকাছি-বয়সী সব ছেলেমেয়ের সঙ্গেই কথাবার্তা হয়। ভাব হওয়া অবশ্য আলাদা কথা—মানে বন্ধুত্ব। যেমন নীচে যারা বসে আছে, টুকাই পারভেজ সুমিত গোগে জর্জদের মতো বন্ধুত্ব সকলের সঙ্গে হয় না। তবে এই ফ্লোরের সিন্‌হা আংকলের মেয়ে মিতার সঙ্গে গোগোলের একটু ভাব আছে। ওরা দুজনে একই ইস্কুলে পড়ে। যদিও গোগোল সকালে, মিতা দুপুরে। আসলে দুপুর হল আফটার-নুন্‌ ক্লাস, সকালটা নুন্‌।

গোগোল এখনো লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে। ওর ডান দিকে, সিঁড়ির পাশেই মহেশানিদের বন্ধ-দরজা ফ্ল্যাট। ওকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে লাহিড়ীদের ফ্ল্যাটের খোলা দরজা। গোগোল মহেশানিদের বন্ধ দরজায় কান পাততে যাবে, আর ঠিক তখনই যদি লাহিড়ীদের ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে আসেন? গোগোলকে পরের বন্ধ দরজায় কান পাততে দেখে কী ভাববেন? ছি ছি!

নীচে লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল। গোগোল টের পাচ্ছে, লিফ্‌ট ওপরে উঠে আসছে। যিনি বা যাঁরাই আসুন, ছ' তলায় এভাবে গোগোলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন। ও আর এক সেকেণ্ড দেরি না করে, ডান দিকে ফিরে, সিঁড়ির ওপরে কয়েক ধাপ উঠে গেল। আর আশ্চর্য লিফট্‌ এসে ছ' তলাতেই দাঁড়াল। কারা যেন নেমে এলেন। ঝপা-ঝপ্‌ লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একজন মহিলা আর দুজন ভদ্রলোক কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেলেন লাহিড়ী-দের ফ্ল্যাটের দিকে। দরজার চৌকাঠের গায়ে বোতাম টিপলেন একজন ভদ্রলোক। তৎক্ষণাৎ লাহিড়ীদের সব থেকে বড় ভাই, যাঁর বয়স প্রায় গোগোলের বাবার মতো, বেরিয়ে এসেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন. "আরে এসো এসো. তোমাদের জন্যই আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।"

লাহিড়ীরা অনেক ভাইবোন, আর বড় দু ভাই-ই বিয়ে করেছেন। অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁদের দরজায় একটা ভিড় লেগে গেল। বাঁচোয়া এই, মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন, দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ সব এমন চুপ-চাপ হয়ে গেল, গোগোলের মনে হল, ছ' তলাটা একটা পোড়ো বাড়ির মতো নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

তা হোক। এটাই সুযোগ! গোগোল এরকমই চেয়েছিল। এখন খুট্‌ করে অন্য কোনো ফ্ল্যাটের দরজা খুলে না গেলেই হল। ও পা টিপে তাড়াতাড়ি নেমে এল। প্রথমেই ইয়েল লকের ছিদ্রে এক চোখ লাগিয়ে, মহেশানিদের ফ্ল্যাটের ভিতরে দেখবার চেষ্টা করল। গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। তার মানে দরজার সামনেই মোটা ভারি পর্দা ঝুলছে। যেমন গোগোলদেরও ঝোলে। কারণ, গোগোল মায়ের কাছেই শুনেছে, এই লকগুলোর সিস্‌টেমই এমন, ভিতর থেকে সব সময়ে চাবিটা না গলিয়ে রাখলে, যে-কেউ বাইরে থেকে, চাবির ছিদ্র দিয়ে ভিতরে দেখতে পারে। পর্দা টাঙানো থাকাই সব থেকে ভাল।

গোগোল ভারি নিরাশ হল। ভিতরে নিরেট অন্ধকার, সামান্য নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। কী করেই বা তা সম্ভব? গোগোল বোকা! ডাবুদার হারানো, আর হনুমন্তিয়াজীর কথা শুনে ওর মাথাটা এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কী শুনতে কী শুনেছিল, নিজেই এখন আর ঠিক করতে পারছে না। ও বন্ধ দরজা থেকে মুখটা সরিয়ে নিতে গেল আর ঠিক তখনই ভিতরে যেন কেউ জিভ দাঁতে ঠেকিয়ে স্‌স্‌স্‌স্‌ শব্দ করে উঠল। গোগোলের বুকের মধ্যে ধক্‌ করে উঠল, তৎক্ষণাৎ দরজায় কান চেপে ধরল। এবার তো আর মিথ্যে নয়! ও সদ্য শব্দটা শুনেছে। অনেকটা সাপের হিসিয়ে ওঠার মতো শব্দ। সাপের হিসিয়ে ওঠার শব্দ ওর ভালই জানা আছে। কেবল যে সাপুড়েদের খেলানোর সাপেরই শব্দ ও শুনেছে, তা নয়। বিষ্ণুপুরে ওর সেজো মাসীর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে, ভাঙা রাজবাড়ির পোড়োয়

ও সত্যিকারের পোষ-না-মানা গোখরোর ফণা আর হিস-হিস শব্দ শুনেছিল। বিষ্ণুপুরের লোকেরা গোখরো সাপকে বলে খরিশ।

কিন্তু সে-কথা আলাদা। মহেশানিদের খালি আর বন্ধ ফ্ল্যাটের মধ্যে শব্দটা কে করল? অথচ শব্দটা একবারই মাত্র শোনা গেল। গোগোল কান চেপেও খানিকক্ষণের মধ্যে আর কোনো শব্দ শুনতে পেল না। আবার সেই আগের মতোই স্তব্ধতা। মহেশানিদের ফ্ল্যাটে কি তা হলে সাপ ঢুকে বসে আছে নাকি?

গোগোল এই কথা ভাববার সময়েই, ওর পিছনে, সিঁড়ির ওপরে যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ও তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে সিঁড়ির দিকে তাকাল। ও কারোকে দেখতে পেল না, অথচ একটা ছায়া যেন সিঁড়ির বাঁকে, ওপর দিকে উঠে গেল। আশ্চর্য তো! কে হতে পারে? বাবা নন তো? তবেই হয়েছে! বাবা হয়তো এতক্ষণ ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে ছিলেন, ডাবুদার মা-দিদিদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, তারপরে এখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। আর গোগোলকে এভাবে মহেশানিদের ফ্ল্যাটের দরজায় দেখে—।

এ পর্যন্ত ভেবে গোগোল মনে-মনেই জোরে মাথা নাড়ল। বাবা তা কখনো করতে পারেন না। বরং বাবা রেগে অবাক হয়ে ধমক দিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেন। কথাটা মনে হতেই, গোগোল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। ওপরে উঠে অবাক হয়ে দেখল, লিফ্‌টের সামনে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে ঘন-ঘন বোতাম টিপছে। সেই যে-লোকটাকে দেখে ওর ড্রাইভারের মতো মনে হয়েছিল। লোকটার ধুলো-পায়ে সেই মোটা সোলের ময়লা স্যাণ্ডেল। ময়লা-ময়লা কালো ট্রাউজার, আর সাদা-কালো ডোরাকাটা জামা দেখে এখনো তাই মনে হচ্ছে। তবে গোঁফজোড়া অবিকল তিনুদার মতো। তার চুল যেন হাওয়ায় উড়ে এখন আরো উস্‌কো-খুস্‌কো। কিন্তু একদম অচেনা। গোগোল ওদের এই ফ্ল্যাটবাড়িতে লোকটাকে কোনোদিন দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না। এ কি তা হলে নতুন এসেছে? সেভেন্‌থ ফ্লোরে কারোর গাড়ি চালায়?

কিন্তু লোকটাকে কেমন অস্থির লাগছে কেন? সে বেশ ঘামছে, আর এমন চোখ-মুখ শক্ত করে কুঁচকে লিফ্‌টের বোতাম টিপছে, যেন তার খুবই তাড়া। আর লিফ্‌ট আসছে না দেখে, সে যেন খুবই রেগে যাচ্ছে। তার চেয়েও গোগোলের কাছে যেটা বেশি আশ্চর্য মনে হচ্ছে, তা হল, লোকটা একবারও গোগোলের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখছে না। কেন? কেউ কাছে এসে দাঁড়ালে, সবাই একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সে যে-ই হন, বা যে-ই হোক। অথচ গোগোল স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, লোকটা কয়েকবারই চোখের কোণ দিয়ে ওকে দেখে নিল। অবশ্য হতে পারে, লোকটার খুবই তাড়াহুড়ো আছে, লিফ্‌ট আসছে না দেখে মেজাজ খারাপ হচ্ছে। তাই কোনোদিকেই নজর নেই।

তবু লোকটাকে কেমন অদ্ভুত লাগছে। গোগোল লিফ্‌টের আরো কাছে এগিয়ে গেল। লিফ্‌ট উঠে এলে, ও বন্ধুদের কাছে একেবারে নীচে নেমে যাবে। ও একবার ভাবল, এ লোকটাই কি সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছিল, আর গোগোলকে দেখে, চট্‌ করে ওপরে উঠে এসেছে? কিন্তু তা কেন সে করতে যাবে? গোগোল কিছুক্ষণ আগে, নীচে বন্ধুদের কাছে বসে, এই লোকটিকে লিফ্‌টে করে একেবারে টপ্‌ ফ্লোরে উঠতে দেখেছিল। লিফ্‌ট কোথাও একবারও থামেনি। এখনো সে টপ ফ্লোরেই, লিফ্‌টের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে, লোকটা যেখানে উঠেছিল,

সেখান থেকেই নামতে যাচ্ছে। তা হলে, মহেশানিদের দরজার কাছ থেকে, সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ গোগোল শুনতে পেয়েছিল? আর সিঁড়ির বাঁকের মুখে কার ছায়াই বা সরে গিয়েছিল?

গোগোল রীতিমতো ভাবনায় পড়ে গেল। ও যেন কোন কিছুরই হাতা-মাথা পাচ্ছে না। ও যা ভাবছে, সত্যি কি সেরকম দেখছে বা শুনছে? নাকি সবটাই ওর ভুল? ও আশেপাশে তাকিয়ে দেখল। কোনো ফ্ল্যাটের দরজাই খোলা নেই। ডাবুদাদের ফ্ল্যাটেরও না। কেউ যদি সত্যি সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসত, গোগোল কি তাকে দেখতে পেত না?

গোগোলের এই ভাবনার ফাঁকেই খালি লিফ্‌ট উঠে এল। লোকটা প্রথম কোলাপসিব্‌ল গেট খুলে, লিফ্‌টের দরজা খুলে খাঁচার মধ্যে ঢুকল। দেরি না করে, গোগোলও ঢুকে পড়ল। লোকটা দুটো দরজাই বন্ধ করে দিয়ে, গোগোলের দিকে মাথা নিচু করে তাকাল। তার হাত লিফ্‌টের বোতামের ওপর। সে যেন ফ্যাসফেসে ভাঙা স্বরে জিজ্ঞেস করল, "খোকা, তুমি কোন্ ফ্লোরে উতারবে?"

তার মানে, লোকটা বাঙালী নয়। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে, গোগোলের শিরদাঁড়াটা যেন কেঁপে উঠল। ভুরুর ওপর ঝাঁকড়া চুলের নীচেই, লোকটার চোখ দুটো যেন ঠিক বাঘের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মুখে একটুও হাসি নেই, বরং কেমন যেন পাথরের মতো শক্ত, ঘামে চক্‌চক্ করছে। গোগোল লোকটার চোখে চোখ রাখতে পারল না, মুখ ফিরিয়ে কোনরকমে বলল, "গ্রাউন্ড ফ্লোর।"

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লিফ্‌ট নড়ল না। গোগোল অবাক চোখে লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা এখনো ওকে দেখছে। সেই বাঘের মতো চোখে। গোগোল তাকাতেই সে যেন একটু হাসল, বলল, "আমি ভি গ্রাউন্ড ফ্লোরে উতার যাব।" বলেও সে এক-একটা বোতামে আঙুল রেখে, যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল। তারপরে "জি" অক্ষর লেখা বোতামটা টিপে দিল।

লিফ্‌ট নামতে লাগল। গোগোল নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার সঙ্গে একলা লিফ্‌টের মধ্যে, ওর কেমন গা ছম্‌ছম্ করছে। পাছে তার সেই বাঘের মতো চোখে চোখ পড়ে যায়, সেই ভয়ে ও চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, লিফ্‌ট কখন নীচে নেমে থামবে। আর তার মধ্যেই ও ভাবছে, মানুষের চোখ এরকম সাংঘাতিক হয় নাকি? কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে, পাইনবনের বন্ধ ট্রলারের ছিদ্রের চোখ দেখে এরকমই মনে হয়েছিল। যেন জ্বলজ্বল করছিল। কিন্তু সে-চোখ ছিল ব্যাংক-ডাকাতদের। এর চোখ দুটো এরকম কেন? আর লোকটা বোতাম টেপার আগে, ওরকম হঠাৎ একটু হাসলই বা কেন? তার ঝকঝকে দাঁতগুলো একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। দাঁতগুলো যেন কেমন ধারালো।

লিফ্‌ট নীচে এসে দাঁড়াল। গোগোল নিজেই তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দরজা খুলতে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ও যেন এতক্ষণ বাঘের খাঁচায় ছিল, এইমাত্র বেরোবার সুযোগ এসেছে। কিন্তু লোকটা নিজেই লিফ্‌টের দুটো দরজা টেনে খুলে দিল। গোগোল আগেই বাইরে বেরিয়ে এল। লোকটা এবার ওর দিকে মোটে ফিরেই তাকাল না। পিছন ফিরে, লিফ্‌টের দরজা বন্ধ করে দিয়ে, সামনের দিকে ফিরল। বন্ধুদের কথা ভুলে, গোগোল লোকটার মুখের দিকে দেখছিল। আশ্চর্য, এখন যেন লোকটার মুখ নরম, আর চোখ দুটো মোটেই জ্বলছে না। গোগোলের দিকে একবারও না তাকিয়ে সে চত্বরে নেমে গেল। চত্বরের ওপর দিয়ে হেঁটে, গেটের বাইরে চলে গেল।

কোনো কারণ নেই, তবু গোগোলের মনে হল, গেটের সামনে গিয়ে দেখবে কি না, লোকটা কোন্ দিকে যাচ্ছে। ঠিক এ সময়েই কেউ ওর ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কানের কাছে চিৎকার করে

শব্দ করল। গোগোল ভীষণ চমকে উঠে, চিৎকার করেই বলল, "কে?"

জর্জ ওর গলা জড়িয়ে ধরে হেসে উঠল। বলল, "কী রে গোগোল, তুই এত চমকে গেলি কেন?"

গোগোল জর্জের ওপর প্রথমটা খুবই রেগে উঠেছিল। আসলে ওর গায়ের মধ্যে তখনো সেই ছমছমানি ভাবটা ছিল। জর্জ আচমকা ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ায়, ও ভয় পেয়েই চমকে উঠেছিল। কিন্তু জর্জের হাসি আর কথা শুনে, ওর ওপর গোগোল রাগ করতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "আর সবাই কোথায় গেল?"

জর্জ বলল, "ওদের সব মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওরা পাশীদের বাড়ির গ্যারেজের সামনে, পিলু আর জ্যাকিকে দেখতে গেল।"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

জর্জ বলল, "পারভেজ বলছিল, ও নাকি পিলু আর জ্যাকিকে দেখলেই বুঝতে পারবে, ডাবুদাকে ওরা চুরি করেছে কী না?"

তা আবার কখনো বোঝা যায় নাকি? গোগোল মনে মনে অবাক হয়ে ভাবল। ও জর্জকে জিজ্ঞেস করল, "তুই গেলি না কেন?"

জর্জ ঠোঁট উল্‌টে বলল, "ডাবুদার ব্যাপারে পিলু জ্যাকিকে আমার কিছুই মনে হয় না। কিন্তু তুই হঠাৎ দৌড়ে লিফ্‌টে উঠে চলে গেলি কেন? তোর বাথরুম পেয়েছিল?"

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "না। শোন্ জর্জ, তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। বাড়ির চত্বরের বাইরে কোথাও যেতে পারব না, হয়তো জানালায় মা রয়েছেন। চল্, আমরা বাগানের একটা কোণে গিয়ে বসি।"

জর্জ অবাক হলেও, আপত্তি করল না। বলল, "চল।"

দুজনে হাত-ধরাধরি করে বাগানের এক পাশে এগিয়ে গেল।

(ক্রমশ)

---

ছবি সমীর সরকার

# ওকিল সাহবের নিমক

## শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্মণের রিক্‌শা পেলে আমি আর কারো রিক্‌শায় উঠি না। তার কারণ এই নয় যে, লক্ষ্মণ পয়সা কম নেয় বা জোরে ছোটে। তার কারণ, ওকে দেখতে মুন্নিলালের মতো। সেই রকম কালো ও লম্বাটে মুখ, শক্ত চোয়াল, হাসি-কুতকুতে দুটো চোখ। আর তেল-চুকচুকে মাথাটির পেছনে একটি লম্বা সরু অনবদ্য টিকির ফাঁস। আমাকে দেখতে পেলে, সে যত রাতই হোক, লক্ষ্মণ তার এক্কাটি এগিয়ে নিয়ে আসবে। চড়ে বসলেই ছুটতে থাকবে ঘোড়ার মতো। উত্তর বিহারের গ্রাম্য হিন্দি ভাষায় দু-একটা কথার আদান-প্রদান হলে ও সবচেয়ে খুশি হয়।

কতকাল আগের কথা, তবু মুন্নিলালকে আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। তার পরনে ঠেঁটি ধুতি, গায়ে ফতুয়া, মায় তার পায়ের দুটো প্রকাণ্ড বুড়ো আঙুল পর্যন্ত।

ওর সঙ্গে বাজারে যেতাম, মাঠে খেলতে যেতাম। দেখতাম কী দোর্দণ্ড প্রতাপ ওর! চুল কাটে, নখ কাটে, নাপিতকে পয়সা দেয় না। দোকান থেকে চারটে বিড়ি তুলে নিল, কেউ কিছু বলল না. একটা বিড়ি ধরিয়ে হয়তো মুন্নিলাল বলল, "আওইছি।" অর্থাৎ আসছি। কিন্তু দোকানদার জানত ও আসবে না। মানে, পয়সা দিতে আসবে না। এলে আবার কয়েকটা বিড়ি তুলে নিতে আসবে।

জেলের লাল পাঁচিলের গা দিয়ে পাকা রাস্তা ছিল—সেই রাস্তা মুনিসিপ্যালিটি আপিস, রেলগুমটি পার হয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছিল কে জানে। সেই রাস্তা দিয়ে সারা দিন ধরে লাইন করে আখ-বোঝাই গোরুর গাড়ি চিনিকলের দিকে যেত। মোটা মোটা কালো আখ, এক-একটা ছাদ অবধি লম্বা। মুন্নিলাল গরুর গাড়ির পেছন থেকে টেনে নিত একটা কি দুটো আখ। হাঁটু দিয়ে ভাঙত। তারপর আমরা আখ চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরতাম।

বিয়াল্লিশের আন্দোলন তখনও হয়নি। তাই প্রতুলকাকা নিজের দোকানে বসে পা-কল চালিয়ে নানান ছিটের জামা সেলাই করত। নিজে কিন্তু খদ্দর ছাড়া অন্য কাপড় ব্যবহার করত না। দোকান থেকে এক-এক সময় যখন চেঁচিয়ে উঠত, "এই মুন্নিলাল, বোল দেবই," তখন ও সরিয়ে নিত হাত। গুমটি পার হয়ে তখন আমরা আখের গাড়ি ধরতাম।

খাবার জিনিস নিলে চুরি করা হয় না, মুন্নিলাল বলত। এমন কী, বাজার থেকে দু-চারটে তামার পয়সা ফেরত এলে তাই দিয়ে কাছারির কাছের দোকান থেকে জিলেবি বা বুনিয়া কিংবা টেনি সা'র দোকান থেকে গুলজামুন বা পেড়া খেলেও চুরি করা হয় না, ও বিশ্বাস করত।

উকিল বন্ধুরা বাবাকে বলত শুনেছি, মুন্নিলালকে ছাড়িয়ে দিন, ও একটা দাগী চোর। মায়ের কাছে প্রতিবেশীদের নালিশ এসেছে, কালসাপ পুষছ বৌমা, একদিন বাড়িতে ডাকাতি হবে।

আমাদের একটা কুটোও কখনও খোয়া যায়নি। তবু মা একদিন মুন্নিলালকে বলল, "চারদিকে তোর এত বদনাম, তোকে আর রাখতে পারব না।"

মুন্নিলাল তার চওড়া চোয়ালের পেশীদুটো নাড়াতে নাড়াতে বলল, যতদিন এ-বাড়িতে ও নোকরি করছে, ততদিন কার সাধ্য এখানে সিঁধ কাটে।

আমাদের বাড়ির পাঁচিলের বাইরে ছিল কলার বাগান। জঙ্গলও বলা যেতে পারে। তারপর খোলা মাঠ খানিকটা। মাঠ ছাড়িয়ে সারি সারি অনেকগুলো তালগাছ। তালগাছগুলোর গা ঘেঁষে হলদে রঙের একটা টালির ঘর। সরকারি মড়া-চেরা ঘর। যারা ট্রেন চাপা পড়ত বা খুন হত বা যে-সব লাশের নাম-ঠিকানা পাওয়া যেত না, তাদের এই মড়া-চেরা ঘরে আনা হত। কাজ হয়ে গেলে আবার নিয়েও যাওয়া হত। কিন্তু আমরা জানতাম, ওই সারি সারি তালগাছগুলোর ওপরে ভূত আছে। পারতপক্ষে আমরা মাড়াতাম না ওদিকটা। রাত্রের দিকে মাঝে মাঝে কান্না শুনতে পেতাম, নাকিসুরে একঘেয়ে কান্না।

মুন্নিলাল বলত, "চুড়ইন।" পেত্নী।

বাবা বলত, "শকুনের বাচ্চা ডাকছে।"

গরমের রাত্রে উঠনে বসে আছি আমরা চৌকির ওপর, হাত পাখার হাওয়া খাচ্ছি, এমন সময় হয়তো এক ঝলক সুগন্ধ বাতাস বয়ে গেল হঠাৎ।

কুয়োতলায় বাসন মাজতে মাজতে মুন্নিলাল বলে উঠত, "ব্রাহ্মণ যাওইছতিন"। অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্য এই পথ দিয়ে যাচ্ছেন।

শুনতে পেলে বাবা বলত, "ধুৎ, পেছনে কলার কাঁদি পেকেছে ; কাল সকালে কেটে আনবি।"

মালিকের মুখের ওপর কথা বলত না মুন্নিলাল।

ওর টিকি ঝাড়া, তারপর সরু টিকিটায় ফাঁশ দেওয়া পেছন দিকে হাত ঘুরিয়ে, আন্দাজে—আমার কাছে অবাক করা এক দৃশ্য। এই দৃশ্যটির অপেক্ষায় একদিন দুপুরে কুয়োতলায় ওর চান করা দেখছি, এমন সময় চোখে পড়ল ওর কাঁধে আর পিঠে অনেকগুলো গোল গোল কালশিটে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী করে লাগল, তো ও বলল, কাউকে যদি না বলি, তবে চোট লাগার গল্পটা আমায় বলবে। আমি বুকে হাত দিয়ে দিব্যি করলাম বলব না,—তখন ও যা বলল, শুনে আমি হতভম্ব!

ওর জবানিতে, বাংলায়, ব্যাপারটা এই রকম :

"রোজ যেমন শুই, ওইখানটায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি ভোর হয়ে গেছে, আঙিনায় আলো। আসলে চাঁদের আলো তা তো আমি বুঝিনি। লোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মাঠে বসে আছি, চোখে পড়ল একটু দূরে সাদা থান-পরা কে-একজন দাঁড়িয়ে আছে। উঠে চলে আসছি, তখনও দেখি সেইরকম দাঁড়িয়ে। আমি এগিয়ে গেলাম। যতই এগোই খোঁখাবাবু, ওর কাছে আর পৌঁছই না। চলছি তো চলছিই। হঠাৎ দেখলাম মুর্দাফরাস-এর পেছনে গিয়ে মিলিয়ে গেল লোকটা।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "মুন্নিলাল, ও ভূত ছিল?"

"আরে সবটা শোনো না। লোটা হাতে ফিরে আসছি, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন আমার পা টেনে দিল। পড়ে গেলাম কাদার ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে হিঁ-হিঁ হিঁ-হিঁ হাসির শব্দ। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তারপর দনাদ্দন দনাদ্দন আমার পিঠের ওপর পড়তে লাগল তাল। জান-এ বেঁচে গেছি খোঁখাবাবু।"

আমি বললাম, "ভূতকে তোমার ভয় করে না মুন্নিলাল?"

"তন্‌কো নই।" কারণ গায়ের জোরে ওর সঙ্গে কে পারবে? কুস্তিতে? তাছাড়া, চাকু থাকে ওর সঙ্গে, যখনই বাইরে বেরোয়। মুশকিল এই দানোদের যে দেখা যায় না; দেখা যায় তো ছোঁয়া যায় না। লড়বে কী করে?

এমনই গায়ে-কাঁটা-দেওয়া ব্যাপার যে, দিব্যি গাললেও মাকে বলে ফেলেছিলাম তাল-পিটুনির গল্প। মাকে বললে কিছু হয় না, আর কাউকে না বললেই হল।

এ নিয়ে মা-বাবার কী যেন পরামর্শ হয়েছিল। সবটা আমি জানি না। জানবার কথাও নয়। বড়দের কথা সব বুঝতেও পারতাম না তখন।

একদিন মাঝ-রাত্তিরে বাবা টর্চ আর লাঠি হাতে ঘর থেকে বেরুল। আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম। মায়ের পাশে ছোট বোনটাও ঘুমোচ্ছিল। মা-ই আমাকে ডেকে তুলে দিল। একা-একা ভয় করছিল বোধ হয়। আমি আর মা শুয়ে শুয়ে আওড়াতে লাগলাম সেই মন্ত্রটা : "ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছেন, করবি আমার কী?"

বাইরে অন্ধকারে বাবার গলা শুনলাম কয়েকবার : মুন্নিলাল। এ মুন্নিলাল। কাঁহা গেলে?

কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাবা ফিরে এল একটু পরে। বলল, "যা বলেছিলাম।"

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, "তুমি কিছু বোলো না। যা বলার আমি বলব।"

সকালে উঠে মা প্রথম ঘর থেকে বেরোত। পরের দিন তেমনি

বেরিয়ে দেখে, সব ঠিকঠাক। উনুন ধরানো, বাসন মাজা, উঠোন-ঝাঁট কিছুই বাকি নেই। মুন্নিলাল কোথায় গিয়েছিল, কখন ফিরল, কে জানে।

বিকেল বেলা মাঠ থেকে খেলে ফিরেছি সদ্য, তখনও মুন্নি-লালের দেওয়া গরমাগরম জিলেবি পেটে গজগজ করছে। মা ডাকল। উঠোনে চৌকির ওপর মায়ের পাশে গিয়ে আমি বসলাম।

নীচে উবু হয়ে বসে মুন্নিলাল।

"কোথায় ছিলি কাল রাত্তিরে? কোথায় গিয়েছিলি? নিশ্চয় চুরি করতে বেরিয়েছিলি।" মা প্রথমেই ওকে বকতে শুরু করে।

মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই মুন্নিলাল বলে ওঠে "আই গে মাইয়া", তারপর আপন কিরিয়া (নিজের দিব্যি) দিয়ে মাথায় হাত রেখে বলে, ও কাজ জীবনে করেনি, করবে না। ছি ছি।

আসল ঘটনা খুলে বলল মুন্নিলাল।

বেগুসরাই থেকে এসেছিল ওর ছোট ভাই। তখন দরোজায় তালা পড়ে গেছে। পাঁচিল টপকে বেরিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে।

# আমি এখন ছোট...

# আমিও তো বড় হবো

বড় হ'য়ে বইটই প'ড়ে, লেখাপড়া শিখে আমিও বাবার মত কাজকর্ম করবো। আমার বাবাও তো ছোটবেলা থেকে তাই করেছে···আজ আমাদের বাড়ি···গাড়ি। দিদির মত আমিও কলেজে পড়বো। তারপর দিদির বিয়ে। সে কী মজা, কত হইচই। তারপর? তারপর আর আমি ভাবতে পারছি না।

**আপনার ছেলের লেখা-পড়া, মেয়ের বিয়ে, নিজেদের অবসর-জীবনের সংস্থান··· এ সব কিছুরই ব্যবস্থা করার মত নতুন নতুন সঞ্চয় প্রকল্প আজ পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব পালন অনেক সহজ করেছে। আমাদের 'ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট' এই রকমই একটি সঞ্চয় প্রকল্প।**

## ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট প্রকল্পে

★ মাসে ৫০ টাকা ক'রে জমালে ১৫ বছর পরে পাবেন ২০,৯০০৲ অথবা ২০ বছর পরে ৩৮,৩০০৲।

★ মাসে ১০০ টাকা ক'রে জমালে ১৫ বছর পরে পাবেন ৪১,৮০০৲ অথবা ২০ বছর পরে ৭৬,৬০০৲।

এছাড়া এই প্রকল্পের অন্যান্য সঞ্চয়-ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:

## ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস: ৭, রেড ক্রশ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১
অথবা যে কোন শাখা অফিস।

চেয়ারম্যান: শ্রী জে. এন. বিশ্বাস

Progressive/UIB-32/77


তারপর ওকে সাতুয়া-চাটনি খাইয়ে স্টেশন পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে আসে।

মাঠ দিয়ে ফিরছিল অন্ধকার রাত্তিরে। ওকে দেখে শেয়াল-গুলো একসঙ্গে ডাকতে শুরু করে। দানো নামলেও শেয়াল ডেকে ওঠে অবশ্য। ব্যাং ডাকছিল, ঝিঁঝি ডাকছিল মাঠে। ওর ভয় করছিল খুব। বাতাসে এক-এক সময় এক-এক রকম গন্ধ ভাসছিল। কখনো ফুলের গন্ধ, কখনো পচা গন্ধ। ভূতেরা খেলা করছে বুঝতে পেরে ও দৌড়তে শুরু করে।

হঠাৎ দেখে, সামনে একটা তালগাছ শুয়ে পড়ে আছে মাঠের ওপর। যেমনি পা তুলে ডিঙোতে যাবে, অমনি গাছটা সরসর করে দাঁড়িয়ে উঠল। একেবারে সোজা সটান।

না, ভূতেরা মারেনি। তালের কাঁদির ওপর বসিয়ে সারা রাত ধরে ওকে দিয়ে মাটি ওজন করিয়েছে। ওজন করতে করতে ওর হাত দুখতে থাকে, পাঁও দুখতে থাকে, তারপর এক সময় ও বেহোঁশ হয়ে যায়। হোঁশ যখন ফিরে এল, দেখে, মুর্দাঘরের পাশে ও শুয়ে আছে। সবুজ চোখওলা একটা শেয়াল কি কুত্তা-ওকে শুঁকছে।

কোনো রকমে ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে ও বাড়ি ফিরেছে। সারা গায়ে ব্যথা।

মাকে জিজ্ঞেস করল, কোনো দাবাই আছে কিনা। ভূতের চোট সারবে কিনা, না জেনেই মা ওকে দুটো বড়ি খেতে দিয়েছিল। একটা বিপদে-পড়া মানুষকে বিনা দোষে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়?

মুন্নিলাল কিন্তু তারপর বেশি দিন থাকেনি।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে সেই দিনটার কথা।

ভোর হয় হয়। উঠোনে লোকের গলা শুনে জেগে উঠেছি। উঠে দেখি, ঘরের দরোজা খোলা। মা-বাবা কেউ নেই। ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

দেখলাম, কুয়োতলার পাশে কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মুন্নিলাল। খালি গা, তেল চকচক করছে। পরনে একটা নেংটি। উঠোনের দরোজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে চেঁচাচ্ছে, "খবর্দার, বোলইছি খবর্দার। ওকিল সাহবকে আঙনামে নই, মু আওইছি।"

মুন্নিলালের চোখ দুটো লাল। বাবা, মা রকের ওপর কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে।

চৌকাঠের বাইরে তিনটে পুলিস। একজনের মাথায় টুপি, হাতে হান্টার।

হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে মুন্নিলাল নিজে এসে পুলিসের সামনে দাঁড়াল। কোনো ভয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে টুপি-পরা পুলিসটা মুন্নিলালকে বেদম মারতে লাগল হান্টার দিয়ে। ওর হাত থেকে পড়ে গেল পুঁটলিটা। দরোজার মুখে ছড়িয়ে পড়ল অনেকগুলো জিনিস। ঘড়ি, রুপোর গয়না, সিল্কের শাড়ি, পেতলের বাসন কয়েকটা। প্রত্যেকটি চুরি করে আনা, কিন্তু আমাদের বাড়ির জিনিস একটাও নয়।

কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিস নিয়ে গেল মুন্নিলালকে।

মা বলল, "ছিঃ মুন্নিলাল, তুই চোর! তোকে কত বিশ্বাস করেছি।"

যেতে যেতে মুন্নিলাল বলেছিল, মনে আছে, "ওকিল সাহবের নিমক খেয়েছি মাইজী, বলে যাচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে এবাড়ির একটা কটোরাও চুরি হবে না। খোঁখাবাবু, বড় হয়ে তুমি যখন হাকিম হবে, তখন আমি ভাল হয়ে যাব। আমার কসুর মাপ কোরো।"

মাপ করব কী, আমি তখন ভয়ে কাঁপছি, কাঁদছি ঝরঝর করে। আমার মুন্নিলালকে কেন মারছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে টানতে টানতে ওরা!

মুন্নিলাল! মুন্নিলাল!!

---

ছবি মদন সরকার

# অলৌকিক

## বিমল কর

**আগে যা ঘটেছে**

বরদা একটা ইংরেজি ভূতুড়ে ছবি দেখতে সিনেমায় গিয়েছিল। তার বন্ধু মানিকেরও কথা ছিল যাবার, কিন্তু সে সময়-মতন এসে পৌঁছতে পারেনি। বরদার পাশে অন্য একটি লোক এসে বসল। বসেই যেন ঘুমোতে লাগল। সিনেমা ভাঙার পর বরদা দেখল, সিটে বসে-বসেই লোকটা মরে গেছে, তার জামায় বুকের কাছে রক্তের দাগ। ভয় পেয়ে পালাল বরদা। নীচে নামতেই মানিকের সঙ্গে দেখা। মানিক পরে এসে অন্য জায়গায় বসে ছিল হাউসের মধ্যে। বরদা বন্ধুকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইল। মানিক রাজি হল না। সামান্য পরে বরদা অবাক হয়ে দেখল, যে লোকটা সামান্য আগে মরে গিয়েছিল—সেই লোকটাই আবার দিব্যি জ্যান্ত হয়ে বেঁচে চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। মানিক আর বরদা লোকটাকে ধরার জন্যে ছুটল। তারপর :

## ২

বরদা বা মানিক কারও মুখে কথা আসছিল না। দুজনেই বার কয়েক ঢোঁক গিলল।

লোকটিও নির্বিকার। ঠোঁটে চাপা হাসি। মজার চোখ করে দেখছে বরদাদের।

এইভাবে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়! অস্বস্তি লাগে। শেষে মানিক গলা পরিষ্কার করার শব্দ করল। বলল, "আপনার সঙ্গে দুটো কথা রয়েছে।" বলে মানিকের খেয়াল হল, লোকটা বাঙালী না অবাঙালী কে জানে। হিন্দী বলতে হবে নাকি? মানিক মনে-মনে হিন্দী সাজাতে লাগল।

লোকটি কিন্তু স্পষ্ট বাংলায় বলল, "বলুন।"

মানিক বলল, "আপনি কি একটু আগে সিনেমা হাউস থেকে বেরিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমরাও সিনেমায় গিয়েছিলাম।" বলে মানিক বরদার দিকে আঙুল দেখাল। "আপনি আমার এই বন্ধুটির পাশের সিটে বসেছিলেন?"

মাথা নেড়ে লোকটি বলল, "বসেছিলাম।"

মানিক এবার বরদার দিকে তাকাল। "তুই বল্ এবার।"

বরদা তখনও নিজেকে ভাল করে সামলে নিতে পারেনি। আমতা-আমতা করে বলল, "আপনি আমার পাশে গিয়ে বসলেন। ছবি তো দেখলেনই না, ঘাড় মুখ গুঁজে ঘুমোলেন। আমি ভেবেছিলাম আপনি ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু ছবি শেষ হবার পর দেখলাম—আপনার বুকের কাছে রক্তের দাগ। আমি ভেবেছিলাম আপনি খুন হয়েছেন কিংবা মারা গেছেন। ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে এলাম। পরে দেখছি আপনি দিব্যি বেঁচে আছেন।"

এবার লোকটি একটু জোরেই হেসে উঠল। বলল, "আচ্ছা, এই ব্যাপার!" এমন ভাবে বলল যেন ঘটনাটা তার কাছে কিছু নয়।

মানিক অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "আমার বন্ধুকে আপনি অকারণ ভয় দেখালেন কেন? আপনার মতলবটা কী?"

লোকটা যেন আরও মজা পেয়ে গেল। বলল, "কেউ ভয় পেলে আমি কী করব! যদি বলি, আপনাকে দেখে আমারও ভয় লাগছে। পুলিসের লোক মনে হচ্ছে।"

তামাশা করছে লোকটা। বরদা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "বাঃ, আপনি মরার মতন চেয়ারে ঘাড় মুখ হেঁট করে বসে থাকবেন, আপনার জামায় রক্ত লেগে থাকবে, আর আমি ভয় পাব না?"

আবার ট্রাম আসছে। ভবানীপুরের দিকে যাবে। সামান্য আগে ওপাশের লাইন দিয়ে এসপ্লানেডের ট্রাম চলে গেছে। চৌরঙ্গী ধরে বাস, মিনিবাস, প্রাইভেট গাড়ি ছোটাছুটি করছিল।

মানিক বলল, "আপনি বড় অদ্ভুত লোক! এমন একটা কাণ্ড করলেন যাতে লোকে ভয় পায়। এখন আবার বলছেন, লোকে ভয় পেলে আপনি কী করবেন। আপনি কি ভেলকিবাজী দেখিয়ে বেড়ান?"

লোকটি এবার আর হাসল না। মানিকের দিকে তাকিয়ে থাকল দু-চার মুহূর্ত। তারপর বলল, "আমি ওই ট্রামটায় উঠব। ইচ্ছে করলে আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন।" বলে একটু থেমে কী মনে করে আবার বলল, "আজ রাত হয়ে গেছে। যদি কাল যেতে চান—আসতে পারেন। আমার ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। কথাবার্তা বলতে চান, বাড়িতে বসে বলা যাবে। কোনো ভয় নেই। আসবেন। অনেক ভেলকি দেখতে পাবেন।"

মানিক ভাবছিল, লোকটাকে ট্রামে উঠতে দেবে না। ধরে ফেলবে। আটকে রাখবে।

নিজের পকেট থেকেই লোকটি এক টুকরো কাগজ, কোনো রসিদ-টসিদের টুকরো বার করল, ডট পেন। হাতের তালুতে কাগজ রেখে ঠিকানা লিখল। লিখে বরদার দিকে এগিয়ে দিল। "আসবেন কাল। কোনো ভয় নেই। খারাপ লাগবে না।"

ট্রাম কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

মানিক তখনও ভাবছে, লোকটাকে শেষ মুহূর্তে হাত ধরে টেনে রাখবে, যেতে দেবে না।

ট্রাম এল। হাত দেখাল লোকটি। দাঁড়াল ট্রাম।

মানিক হাত বাড়াল, ওকে যেতে দেবে না, হাত টেনে ধরবে।

লোকটার হাত ধরে ফেলেছিল মানিক। ধরামাত্র তার যে ঠিক কী হল বুঝল না, ইলেকট্রিক শক্ লাগার মতন আঙুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত ঝিনঝিনিয়ে উঠল। অবশ হয়ে গেল হাত।

ততক্ষণে লোকটা ট্রামে গিয়ে উঠে পড়েছে।

মানিক তখনও হাত ঝাড়ছে, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের বাহুমূল টিপছে। ট্রাম ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল।

বরদা কিছু বুঝতে পারেনি। মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "কীরে, কী হল?"

মানিক চোখমুখ কুঁচকে বলল, "হাতটা ভেঙেই দিয়েছে রে! সাংঘাতিক জোর ভাই! কোন্ প্যাঁচ মারল কে জানে! বেটা জুডো প্লেয়ার।"

হাত সামলাতে সামলাতে হাঁটতে লাগল মানিক। বরদাও।

"চল, একটু চা খাই," বরদা বলল, "আমার গলা শুকিয়ে গেছে।"

চায়ের দোকানে এসে বসল দু বন্ধু।

বরদা ঠিকানা-লেখা কাগজটা বার করল। আলোয় রেখে দেখল। বলল, "লোকটার নাম সিদ্ধেশ্বর ভৌমিক ; সদর স্ট্রীটের ঠিকানা।" বলে কাগজের টুকরোটা মানিকের দিকে এগিয়ে দিল।

মানিক নাম-ঠিকানা দেখতে দেখতে বলল, "যাবি?"

বরদা ভাবছিল। "বুঝতে পারছি না।"

"আমার রাগ হচ্ছে। লোকটা আমায় জব্দ করে গেল।"

"তোর চেয়েও আমি বেশি জব্দ হয়েছি। আমি কিছুই

করিনি, তবু লোকটা আমায় নার্ভাস করে দিয়েছিল।"

"ওর মতলব কী?"

"ভগবান জানেন।"

"তা হলে চল, কাল যাই।"

বরদা দু হাতে মাথার চুল সামলাতে সামলাতে বলল, "আবার কোন ভেলকি দেখাবে কে জানে!"

মানিক বলল, "দেখালে দেখব। বিনি পয়সায় ম্যাজিক।"

"এসব লোক ভাল নাও হতে পারে।"

"মন্দ যদি হয় তবে এদের সত্যিই পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। চল, যাই, কালকেই।"

পরের দিন বিকেলে বরদা আর মানিক সদর স্ট্রীটে গিয়ে হাজির। কলকাতার এই সব পাড়ার চেহারাটাই যেন কেমন,. চালতাবাগান বাদুড়বাগান ইত্যাদি পাড়ার সঙ্গে মিল খায় না। সেকেলে বড়-বড় বাড়ি, ভাঙা রেলিং, কোথাও-কোথাও ভাঙা বাড়ির স্তূপ, বড়-বড় গাছ এদিককার চেহারা অন্যরকম করে রেখেছে। রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা।

সিদ্ধেশ্বর ভৌমিকের আস্তানা খুঁজে বার করতে একটু কষ্টই হল। পুরনো একটা বাড়ি ভাঙা চলছে। ইট-কাঠের স্তূপ জমেছে পাহাড়প্রমাণ। তারই গায়ে-গায়ে পাঁচিল-ঘেরা একটা ছোট বাড়ি। ভাঙাচোরা ফটক খোলাই পড়ে আছে।

বরদারা ভেতরে ঢুকে চার পাশে তাকাল। আগাছার জঙ্গল চারদিকে, দু-চারটে মামুলি গাছও রয়েছে। নিম, জাম। একদিকে বুঝি আস্তাবল ছিল আগে, এখন মস্ত একটা উনুন চোখে পড়ে। বোধ হয় ধোপাখানা হয়েছিল।

বাড়ির এটা পেছন দিক কিনা বোঝা গেল না। আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে ঘুরে আসতেই বোঝা গেল বাড়িটা দেড়তলা গোছের। সামনের দিকটা দেখতে খারাপ লাগে না। পাতাবাহারের গাছ। দু-চারটে লতা উঠেছে থাম বেয়ে, কিছু বাগান-সাজানো গাছ নিজের খেয়ালে বেড়ে উঠেছে।

লোকজন চোখে পড়ছিল না। কোথায় সিদ্ধেশ্বর?

ডান দিকে কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় টালি দেওয়া। দেড়পাক ঘুরে ওপরে উঠেছে। বাড়িটার সামনের দিকটাই তা হলে দেড় বা দু তলা। পেছনটা একতলা।

মানিক বলল, "লোক কই রে?"

বরদাও অবাক হচ্ছিল। বাইরে একটাও লোক নেই কেন? কোথায় গেল সব?

কাঠের সিঁড়ির দিকে এগুতে-এগুতে মানিক বলল, "এটা যদি ভুতুড়ে বাড়ি হয়, কী করবি?"

"ভুতুড়ে বাড়ি?"

"ধর, কালকের সিনেমার মতন হল। একটাও লোক নেই, জন নেই, আমরা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে যখন শেষ ঘরটায় গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম বিরাট এক খাটের ওপর চাদরচাপা সিদ্ধেশ্বরের মৃতদেহ পড়ে আছে। তখন?" বলে মানিক ঠাট্টা করে হাসল।

বরদা বলল, "কালকের সিনেমায় কফিনের পাশে একটা গাল-তোবড়ানো, নেড়া-মাথা লোক বসে ছিল। এখানেও একটা লোক নিশ্চয় থাকবে।"

"যদি না থাকে?"

"পালাব। কেটে পড়ব সেরেফ।...একটা হাঁক দে না?"

সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল মানিক। পাশে বরদা। সিঁড়িতে উঠবে কিনা ভাবছিল।

এমন সময় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। নীচেই কোথাও যেন ছিলেন সিদ্ধেশ্বর। সাড়া দিলেন।

বরদারা চমকে উঠেছিল।

এগিয়ে এলেন সিদ্ধেশ্বর। পরনে পাজামা, গায়ে একটা আল-খাল্লা-মতন। হাতে রবারের গ্লাভ্‌স। গ্লাভ্‌স খুলতে খুলতে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আসুন—আসুন। আপনাদের আসতে দেখেছি। একটা কাজ সারছিলাম। আসুন।"

সিদ্ধেশ্বর বেশ খাতির করে বরদাদের ডেকে নিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায় এসে হাঁক দিলেন সিদ্ধেশ্বর। একটু পরেই ঢ্যাঙা চেহারার একজন বেরিয়ে এল ভেতরের ঘর থেকে।

চেয়ার-টেয়ার পেতে দিতে বললেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা আর মানিক এ-পাশ ও-পাশ দেখছিল। টানা বারান্দা। বারান্দার গা-লাগিয়ে পর পর তিনটি ঘর, পাশাপাশি। আগের দিনের রেওয়াজ-মতন খড়খড়ি দেওয়া দরজা, দরজার ওপাশে কাচের ভাঁজ-করা দ্বিতীয় দফার দরজা। পরদা ঝুলছিল।

বারান্দায় বিশেষ কিছু নেই। দু চারটে ফুলের টব, পাখির শূন্য খাঁচা। সাদামাটা একটা বেঞ্চি। পুরনো এক মোটর-বাইকও চাকা-খোলা হয়ে পড়ে আছে।

চেয়ার এল।

"বসুন," সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনারা বসুন, আমি ভেতর থেকে আসছি একবার।"

বরদারা বসল।

বিকেল পড়ে গিয়েছে। ঝাপসা হয়ে আসছিল। আর-একটু পরেই অন্ধকার নামবে। এ-রকম এক চুপচাপ, নিঝুম বাড়িতে এসে কেমন যেন লাগছিল বরদার। ভয় না উদ্বেগ, সে বুঝতে পারল না।

মানিক আজ খুব তক্কে-তক্কে আছে। সমস্ত কিছু নজর করছে। কাল সে বড় বোকা বনে গিয়েছিল। সিদ্ধেশ্বরকে লক্ষ রাখছে।

মানিক বলল, "কেমন মনে হচ্ছে রে?"

"বুঝতে পারছি না।"

"সিদ্ধেশ্বর খুব ভদ্রতা করছে।"

"তুই ওর ওপর চটে রয়েছিস?" বরদা হাসবার চেষ্টা করল। "আর চটিস না।"

সিদ্ধেশ্বর ফিরে এলেন, বসলেন। বললেন, "আগে চা খান।"

বরদা বলল, "আপনি এখানে একা থাকেন?"

"না। আমি এখানে থাকি না। মাঝে-মাঝে আসি।"

বরদা অবাক হল। "কে থাকে এখানে?"

"থাকে দু-একজন। আমাদেরই লোক।"

মানিক বলল, "আপনি কোথায় থাকেন?"

"আমাদের থাকার অন্য জায়গা রয়েছে, কলকাতায় নয়। কাজ-কর্ম করার সেন্টার আছে। সেখানে।"

"কিসের সেন্টার?"

"মুখে বললে আপনারা বুঝবেন না।" নরম করে হাসলেন সিদ্ধেশ্বর। সামান্য থেমে আবার বললেন, "মানুষের নানারকম লুকনো শক্তি থাকে। সকলের নয়। কারও-কারও। কেউ কেউ আবার আচমকা একটা শক্তি পায়, আবার হারিয়ে ফেলে। আমরা মানুষের এই অবিশ্বাস্য, কিংবা বলতে পারেন অলৌকিক শক্তি নিয়ে হাতে কলমে পরীক্ষা করি। কেন এমন হয়? কী তার কারণ?"

"তার মানে ভূতুড়ে গবেষণা করেন?" মানিক বলল।

"তাও বলতে পারেন।"

এমন সময় ঢ্যাঙা চেহারার লোকটি চা নিয়ে এল। চা আর নোনতা বিস্কিট, কয়েকটা প্যাসট্রি।

লোকটা চলে যাচ্ছিল। সিদ্ধেশ্বর তাকে দাঁড়াতে বললেন। বলে বরদাদের দিকে তাকালেন। বললেন, "ওর নাম কেষ্টপদ মণ্ডল। ক্রীশ্চান। আমাদের কাছে আট-দশ বছর রয়েছে। কেষ্ট-পদ দু-একটা জিনিস পারে যা অন্যে পারে না। দেখবেন?"

মানিক বরদা কৌতূহল বোধ করল। বলল, "দেখি।"

সিদ্ধেশ্বর কেষ্টপদকে বললেন, "মণ্ডল, ওই পাখির খাঁচা-টাকে তুমি ছোঁবে না। না ছুঁয়ে দুলিয়ে দাও।"

মানিক বরদার দিকে তাকাল। বরদা মানিকের দিকে। তারপর দু জনেই কেমন অবাক হয়ে কেষ্টপদর দিকে তাকাল।

কেষ্টপদ ধীরে-ধীরে পাখির খাঁচাটার কাছে গেল, গিয়ে হাত খানেক তফাতে দাঁড়াল।

মানিক বরদা তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল।

মাথা সোজা করে খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল কেষ্টপদ। খাঁচাটা স্থির। কেষ্টপদও স্থির।

সময় বয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারও হয়ে এল ধীরে-ধীরে।

হঠাৎ যেন খাঁচাটা নড়ে উঠল। কেষ্টপদ আরও একটু পিছিয়ে এল। নড়তে লাগল খাঁচাটা। দুলতে লাগল। দুলতে-দুলতে জোর হল। যেন ঝোড়ো বাতাসে খাঁচাটা দুলছে।

বরদা স্তম্ভিত। মানিক কাঠ হয়ে গেল।

যেন কোনো ভৌতিক শক্তিতে অদ্ভুতভাবে দুলছিল খাঁচাটা—অথচ বারান্দার কোথাও কোনো ঝোড়ো বাতাস নেই।

(ক্রমশ)

ছবি মদন সরকার

## বিশ্ব-বিচিত্রা

### দিদিমণি

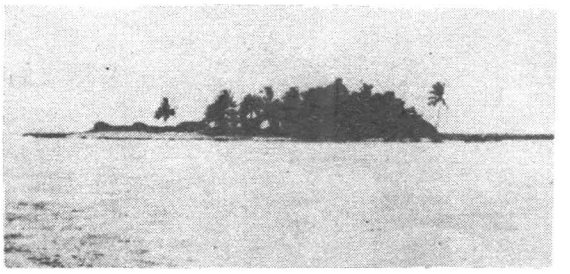

# প্রবাল দ্বীপ

পৃথিবীর সব সমুদ্রেই দ্বীপ আছে, তবে এই দ্বীপগুলো একভাবে তৈরি হয়নি। কিছু-কিছু দ্বীপ সমুদ্রের ডুবো পাহাড়ের অংশ, কিছু-কিছু দ্বীপ মালভূমির উচ্চতম অংশ, কিছু-কিছু দ্বীপ আবার সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে যে লাভা বেরিয়ে এসেছিল তাই দিয়ে তৈরি। এছাড়া, মহাদেশের কাছাকাছি দ্বীপগুলো আসলে মহাদেশেরই বিস্তীর্ণ অংশ, যার মধ্যভাগ কোনো কারণে বসে গিয়ে সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এছাড়াও সমুদ্রের যে অংশ কর্কট ক্রান্তি আর মকর-ক্রান্তি বলয়ের মধ্যে রয়েছে সেখানে মহাদেশ থেকে বহু দূরে বা মহাদেশের কাছাকাছি আর এক রকমের দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায় যাকে বলা হয় প্রবাল দ্বীপ। এই দ্বীপ প্রবাল কীট ও তার দেহ নিঃসৃত পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রবাল দ্বীপ অবশ্য পৃথিবীর সব জায়গায় দেখা যায় না।

প্রবাল কীটের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্যে কয়েকটি বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন। প্রথমত সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা ৬৮° ফারেনহাইটের কাছাকাছি হওয়া চাই। এই তাপমাত্রা বিষুবরেখার উত্তরে ৩০° উত্তর অক্ষাংশ এবং বিষুব রেখার দক্ষিণে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সাধারণত দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই কর্কটক্রান্তি বা মকর-ক্রান্তি থেকে বেশি দূরে প্রবাল দ্বীপ দেখা যায় না। বেশির ভাগ প্রবাল দ্বীপই মহাদেশের পূর্বদিকে দেখা যায়, কারণ, ক্রান্তি বলয়ের মধ্যে অবস্থিত মহাদেশগুলিতে পূর্বদিক দিয়েই উষ্ণ সমুদ্র স্রোত বয়ে গেছে।

প্রবাল কীট আবার ১৫০ ফুটের চেয়ে গভীর জলে বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ, জলের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাপমাত্রা কমতে থাকে আর কমতে থাকে সূর্যের আলো। সেই জন্য প্রবাল কীট জন্মের জন্য অগভীর অথচ উষ্ণ সমুদ্রের প্রয়োজন। এ ছাড়াও যেখানে কোনো নদীর জল সমুদ্রে এসে পড়ে সেখানেও প্রবাল কীট বাঁচতে পারে না। কারণ, টাটকা জলে প্রবাল কীটের জন্মের উপযোগী লবণ থাকে না। ঘোলা জলও প্রবাল কীটের জন্মের পক্ষে অনুকূল নয়।

উষ্ণ সমুদ্রের পরিষ্কার অগভীর জলে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবাল কীট জন্মায়। এই প্রবাল কীটের শরীর থেকে চুনের মতো এক রকম শক্ত বস্তু বের হতে থাকে, যেগুলো প্রবালের দেহ সংলগ্ন থাকে এবং বিভিন্ন ধারায় বৃদ্ধি পেতে পেতে ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সমুদ্রের ঢেউ এই চুন জাতীয় পদার্থকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে এবং এই গুঁড়ো সমুদ্রের তলায় জমা হয়। এইভাবে প্রবাল কীটের জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে ও চুন জাতীয় পদার্থ ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠতে উঠতে জলের উপরিভাগে স্থলের সৃষ্টি করে। ক্রমশ সমুদ্রের ওপরে জেগে ওঠা চুনের স্তর মাটিতে পরিণত হয়।

পাখিরা সেখানে বীজ এনে ফেলে, গাছপালা জন্মায়, এইভাবে প্রবাল দ্বীপের সৃষ্টি হয়। এই প্রবাল দ্বীপ তৈরি হতে কিন্তু অনেক সময় লাগে। এক ফুট উঁচু হতে প্রবাল দ্বীপের অন্তত দশ বছর সময় লেগে যায়। কোনো প্রবাল দ্বীপ স্থলভাগের একেবারে পাশে তৈরি হয়, কোনো-কোনো প্রবাল দ্বীপ মহাদেশ থেকে একটু দূরে উপকূলের প্রায় সমান্তরাল রেখায় তৈরি হয়। যেমন, অস্ট্রে-লিয়ার পূর্ব উপকূলের বেরিয়ার রীফ। আবার, কোনো প্রবাল দ্বীপের চারদিকে থাকে স্থলভাগ এবং মাঝখানে জলাভূমি বা হ্রদ। এগুলোকে বলে 'অ্যাটল'।

# ডোডো তাতাই

**লেখা/তারাপদ রায়**
**রেখা/কৃত্তিবাস রায়**

আজ তাতাইবাবুদের বাড়িতে ডোডোবাবুর নেমন্তন্ন। আজকাল ডোডোবাবু হোস্টেলবাসী, অনেক-দিন পরে দুজনে একসঙ্গে খাচ্ছেন। খাবার-দাবার বেশি নয়, তবে হোস্টেলে থাকেন বলে ডোডোবাবুর জন্য শাক, সুক্তো. এই সব—যাকে 'বাড়ির রান্না' বলে তাই তাতাইবাবুর মা করেছেন। বলা উচিত যে, এই সব খাদ্য ডোডোবাবু বা তাতাইবাবু কারোই তেমন পছন্দ নয়। তা হোক, তাতাইবাবুর মা কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাই দুজনেই মন দিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং এরই মধ্যে একটু উলটো পালটা কথাবার্তাও চলছে।

একটা প্লেটে শশার কুচি, আদা, লঙ্কা ধনেপাতা দেওয়া আছে, এই জিনিসটা ডোডোবাবুর খুব পছন্দ, একটা নুনদানি থেকে তাতে নুন ছিটোতে লাগলেন, তাতাইবাবু একবার দেখে নিয়ে বললেন, "কী করছেন? ভাত খাওয়া শুরু করুন।" ডোডোবাবু মৃদু হেসে বললেন, "দাঁড়ান, আগে কাটা শশায় নুনের ছিটে দিই।" ডোডোবাবুর কথার কায়দায় তাতাইবাবু হেসে ফেলে বললেন, "ঐ যে ঢেঁকি শাক আসছে, এইবার অনুরোধ, ঢেঁকি গিলুন।" সত্যি সত্যিই তাতাইবাবুর মা ইতিমধ্যে ঢেঁকি শাক দিয়ে দিয়েছেন দুজনের পাতে। অনুরোধে না হোক, তাতাইবাবুর মা সামনে রয়েছেন, তাই ভয়ে ভয়ে ডোডোবাবু একটু চোখমুখ কুঁচকিয়ে শাকভাত খেতে লাগলেন। আর তাতাইবাবু বিন্দুমাত্র শাক খেয়ে ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে ডোডোবাবুকে বললেন, "এই সব শাকপাতা খেতে হয়, না হলে শরীর ভাল থাকবে না।"

ডোডোবাবু দাঁতে-দাঁত চেপে নিচু গলায় তাতাই-বাবুকে বললেন, "তুমি ঘোরো ডালে ডালে, আমি ঘুরি পাতায় পাতায়।" এর পরেই কী একটা মারাত্মক গোলমাল দুজনের মধ্যে দেখা দিল। কথা কাটাকাটি থেকে হাতা-হাতি, তাতাইবাবুর মা রান্নাঘরে গিয়েছিলেন, এসে দেখেন কেলেঙ্কারি, খাবার পড়ে আছে, দুজনে লড়ছেন।

একটু পরে লড়াই অবশ্য থামল, কিন্তু, দুজনে দুমুখো হয়ে খেতে লাগলেন। ডোডোবাবু-তাতাইবাবু কেউই ঝাল খেতে পারেন না, তাই নরম করে মাছের সুক্তো রান্না করা হয়েছে। সুক্তো জিনিসটা ছোট বয়স থেকে খেয়ে খেয়ে দুজনেরই প্রিয় এবং সুক্তো পাতে পড়তেই দুজনেই আবার ঘুরে মুখোমুখি হয়ে গেলেন, ডোডোবাবু তাতাইবাবুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "আমি হলাম সুক্তোর ভক্ত নরমের যম।" তাতাইবাবু বললেন, "আমিও তাই।"

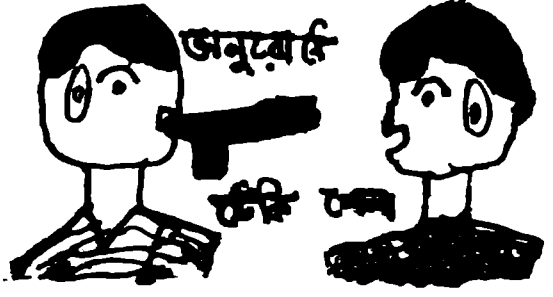


## মণিমেলার খবর

**কেন্দ্রীয় সমাচার**

মণিমেলা মহাকেন্দ্রের নিয়মিত শাখাকেন্দ্রগুলি ২ আগস্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিন পালন করেছে। এই উপলক্ষে বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।

গত ৩১ জুলাই ও ৭ আগস্ট বার্ষিক মণি প্রতীক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পদ্মরাগ, মরকত, নীলা ও হীরক—এই চারটি পর্যায়ে এ বছর প্রায় ২,৫০০ মণিভাইবোন পরীক্ষা দিয়েছে।

আগামী ১৬, ১৮, ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর আন্তঃমণিমেলা খো-খো প্রতিযোগিতা এবং ২ অকটোবর প্যারেড ও পি টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

**মণিপ্রদেশ**

কলকাতার ইউনিক পার্কে মণিমেলার বিংশতিতম বার্ষিক উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। নবদ্বীপের পঞ্চবটী মণিমেলা গত ১ জুলাই নিজস্ব খেলার মাঠে মণিমেলার পঞ্চম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। শ্যামনগরের আতপুর বৈশাখী মণিমেলার চতুর্থ বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। দুর্গাপুরের ঝিলিমিলি মণিমেলার তৃতীয় বার্ষিক উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। সোনার-পুরের কিংশুক মণিমেলার তৃতীয় বার্ষিক উৎসব ৭—৯ জুন নানা আকর্ষক অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বারুইপুরের আজাদ হিন্দ মণিমেলা ১২—১৩ মে তৃতীয় বার্ষিক উৎসব পালন করল। ২৪-পরগনার বজবজ মণিমেলার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব ১২ জুন চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান সূচীর মাধ্যমে পালিত হয়েছে। গোবরডাঙ্গার শরৎস্মৃতি মণিমেলার প্রথম বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হল। হুগলীর আরামবাগ বিবেকানন্দ মণিমেলার বার্ষিক উৎসব সফল মঞ্চানুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে। নৈহাটী মণিমেলা সম্প্রতি নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করেছে।


শুধুমাত্র পাশ করতে নয়,
মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশী নম্বর তুলতে
অদ্বিতীয় অভিনব এক বই !
AN ANALYTICAL APPROACH TO
EXHAUSTIVE
QUESTIONS
FOR
NINETEEN SEVENTYEIGHT & NINETEEN SEVENTYNINE
Price : Rs. 15/- only
এ বই কিনলে TEST PAPER
কেনার আর দরকার হয় না
B. B. KUNDU & SONS
18L, TAMER LANE, CALCUTTA-9
Phone : 34-7328

# উঠতি খেলোয়াড়দের কথা

পুষ্পেন সরকার

কলকাতার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ খেলা এখন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এ লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে। ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ান এবং ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা বৃষ্টিতে আটকে না গেলে চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন অনেক পরিষ্কার হয়ে যেত। কোন অঘটন না ঘটলে ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়ন এবং মোহনবাগানের রানার্সের সম্মান পাবার সম্ভাবনা বেশি।

এ বছরে লীগ খেলায় তরুণদের সাফল্যই বেশি করে চোখে পড়ছে। এটা আশা ও আনন্দের। তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ। অনেকদিন ধরে যারা খেলছে তাদের কাছ থেকে নতুন কিছু পাবার আশা কম। দলের, রাজ্যের বা দেশের সুনাম বাড়াবার দায়িত্ব ঐ তরুণদের হাতেই। প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়ের সংখ্যা যত বাড়বে ততই ফুটবল-মানের উন্নতি হবে।

ইস্টবেঙ্গলের তরুণ গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলী এ বছর ময়দানে সেরা গোলরক্ষক। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তাঁর অসাধারণ খেলার কথা অনেকদিন মনে থাকবে দর্শকদের। ব্যাক চিন্ময় চ্যাটার্জী ও শ্যামল ব্যানার্জী খুবই আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলছেন। হাফব্যাক প্রশান্ত ব্যানার্জী কাবুল সফর থেকে ফিরে এসে দলের শক্তি বাড়িয়েছেন। ফরোয়ার্ডে মিহির বসুর অনেক বড় হবার সম্ভাবনা।

এরিয়ানের বিরুদ্ধে জয়সূচক একমাত্র গোল করার পর মোহনবাগানের রাইট আউট মানস ভট্টাচার্য ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়ে কাবুল চলে গিয়েছিলেন। এক মাস পর ফিরে এসে প্রথম খেলাতেই পোর্ট ট্রাস্টের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে দেখিয়ে দিলেন তাঁর কৃতিত্ব। পরের খেলাতে আবার ক্যালকাটা জিমখানার বিরুদ্ধে চার গোল সমান ভাগ করে নিলেন মানস ও বিদেশ। এখন দলের আক্রমণের প্রধান অস্ত্র ও'রা দু-জন। মোহনবাগানের ফরোয়ার্ড লাইনে শ্যাম থাপা, সুভাষ ভৌমিক এবং হাবিবের খেলার দিন শেষ হয়ে আসছে। মানস ও বিদেশ পুরোভাগের শক্তি বাড়িয়ে তুলবে আশা করা যায়।

মহমেডান স্পোরটিংয়ের চার ব্যাকের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্যাম কর্মকার সব থেকে ভাল খেলছেন। দাদা সুধীর কর্মকারের মত বড় হবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করছেন। দেখতে ছোট-খাট। খেলার মাঠে কিন্তু অনেক বড় হয়ে ওঠেন। এছাড়া হাফব্যাক পলরাজ ও সুকুমার মুখার্জী রক্ষণ ও আক্রমণ বিভাগকে প্রশংসনীয়ভাবে সাহায্য করছেন। ব্যাক হাবিব খাঁ এবং ফরোয়ার্ডে সাজ্জাদ আরও উন্নতি করবেন।

এরিয়ানের গোলরক্ষক লক্ষ্মণ বেলেল মহমেডানের তরুণ বসু বা ইস্টবেঙ্গলের ভাস্কর গাঙ্গুলী থেকে খুব বেশি পিছিয়ে নেই। লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে গোল করা যে-কোন ফরোয়ার্ডের পক্ষে শক্ত কাজ। স্টপার সমীর মুখার্জী প্রতিটি খেলাতেই রক্ষণভাগের অনেকটা দায়িত্ব একাই পালন করেন। বিপক্ষের

## ঝন্টু-মন্টুর গল্প (১১)

চিত্র—পরাগ রায়
বয়স—১১ বছর

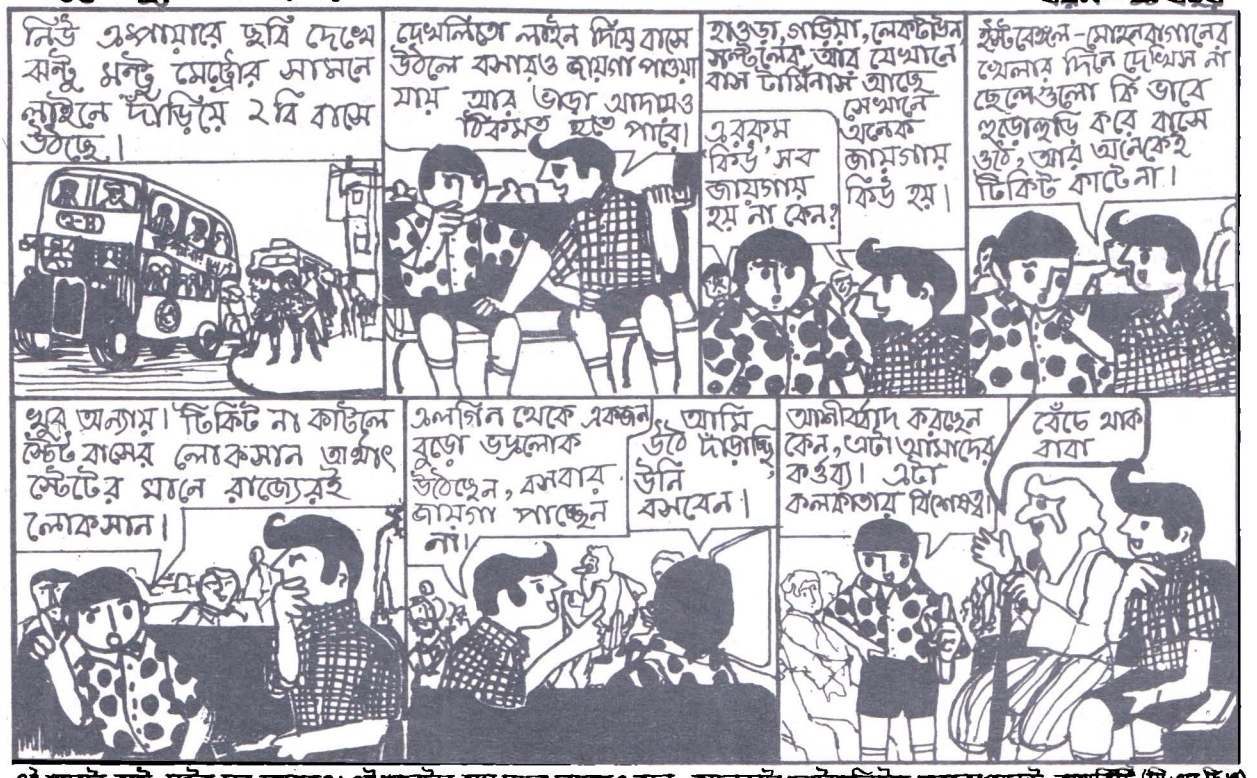




এই শহরটা ঝন্টু-মন্টুর মত আমারও। এই শহরটার ভাল মানে আমারও ভাল,—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)


'সুতানুটি গেজেট' (বাংলা), 'ক্যালকাটা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার' (ইংরাজী) প্রতিটির দাম এক টাকা। নগদে বা মনিঅর্ডারে সি.এম.ডি.এর অফিস ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭তে পাওয়া যাচ্ছে।

আক্রমণের মুখে ঠিক সময়ে সঠিক জায়গা বেছে নেবার সহজাত ক্ষমতা আছে। সমীরের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ফরোয়ার্ডে উদয় দাসের তীব্র গতি আক্রমণে বিশেষ সাহায্য করে।

জর্জ টেলিগ্রাফে অধিকাংশই তরুণ খেলোয়াড়। এবারের লীগ তালিকায় প্রথম পাঁচ-ছয়টি দলের মধ্যে জর্জের স্থান থাকবে। দলের শক্তির প্রধান স্তম্ভ দুই হাফব্যাক। বিশেষ করে ছোট-খাট চেহারার প্রবীর ঘোষ দলকে অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেন। লেফট হাফ উত্তম মজুমদার খুব পরিশ্রমী। দু-জনেই উন্নতি করবেন।

লীগ মরসুমের শুরু থেকে টানা ১৫টি খেলায় অপরাজিত থাকা সহজ কথা নয়। মহমেডানের সঙ্গে ড্র করা এবং এরিয়ানকে হারানোর মধ্যে প্রচুর কৃতিত্ব আছে। বি এন আর-এর এই কৃতিত্বের ১৪ আনা দাবি করতে পারেন গোলরক্ষক এবং চার ব্যাক। তরুণ গোলরক্ষক প্রতাপ ঘোষ দলের বড় ভরসা। এ বছর লীগে কয়েকজন গোলরক্ষক খুবই ভাল খেলছেন। উঠতি তরুণদের মধ্যে প্রতাপ অন্যতম। স্টপার বিপ্লব মজুমদারকে আগামী দু-এক বছরের মধ্যে বড় দলে খেলতে দেখলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

মাঝারী অনেকগুলি দলের বিরুদ্ধে চন্দ্রর সাফল্য দলীয় শক্তির পরিচয় দেয়। চমৎকার বোঝাপড়া আছে খেলোয়াড়দের মধ্যে। সকলের মধ্যে ফরোয়ার্ডে শেখর চক্রবর্তীকে বিশেষ করে চোখে পড়ে। স্ট্রাইকার হিসাবে শেখরের নাম করার সম্ভাবনা। ইস্টবেঙ্গলের কাছে চন্দ্রকে অবশ্য পাঁচ গোলে হারতে হল।

খিদিরপুর প্রতি বছরই ময়দানে কিছু নতুন প্রতিভাকে পরিচিত করায়। স্টপার তরুণ মুখিয়া এবারের আবিষ্কার। শক্ত সমর্থ পাহাড়ী ছেলে। সহজাত প্রতিভার অধিকারী। কলকাতার মাঠের আবহাওয়ায় রপ্ত হয়ে উঠলে এবং উন্নত শিক্ষা পেলে তরুণ যে কোন দলের রক্ষণ ভাগের বড় ভরসা হয়ে উঠবেন। আক্রমণ-ভাগে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের সুনামের আশা আছে। বিশ্বজিৎ ও ডেনিস উইলিয়ামসনের যোগাযোগেই খিদিরপুরের অধিকাংশ আক্রমণ রচিত হয়।

অন্যান্য দলের মধ্যে রাজস্থানের হাফব্যাক তপন দাস, পোর্ট ট্রাস্টের ফরোয়ার্ড মৃদুল ব্যানার্জী ও হাফব্যাক অশোক চ্যাটার্জী এবং বাটার স্ট্রাইকার সোমনাথ ব্যানার্জীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কাস্টমসের দুই স্ট্রাইকার পার্থসারথি দাস ও অমর্ত্য ঘোষ একক খেলা ত্যাগ করে দলকে সাহায্য করলে আরও উন্নতি করবে। ইস্টার্ন কমান্ডের হাফব্যাক দীপক রাই, হাওড়া ইউনিয়নের ফরোয়ার্ড পিনাকী মুখার্জী এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘের ফরোয়ার্ড ক্রিস্টোফার গোমেজকে আগামী বছর আরও উন্নত খেলোয়াড় হিসাবে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রথম বিভাগের দলগুলিকে ভালভাবে বিচার করলে প্রত্যেক দলেই দু-একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। জুনিয়র ডিভিশন থেকে আসা বা মফস্বল শহর থেকে আমদানি খেলোয়াড়রা প্রথম বছরেই দলের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। এ ছাড়া দলীয় খেলোয়াড়দের ব্যর্থতায় অনেক সময় তাঁদের সঠিক প্রতিভা যাচাই হয় না।

আজ যাঁরা ময়দানে বড় দলের নামী খেলোয়াড়, তাঁদের অনেককেই খেলোয়াড়-জীবনের শুরুতে অখ্যাত ও অবজ্ঞাত থাকতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিভা কোনদিনই চাপা থাকে না। সুতরাং ছোট ছোট দলে থাকার ফলে আজ যাঁদের পরিচয় অনেকেই জানে না, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে ভবিষ্যতে সুরজিৎ, গৌতম, মিহির বা মানস হয়ে উঠবেন না, তা কে বলতে পারে?

ফোটো: মনোজিৎ চন্দ

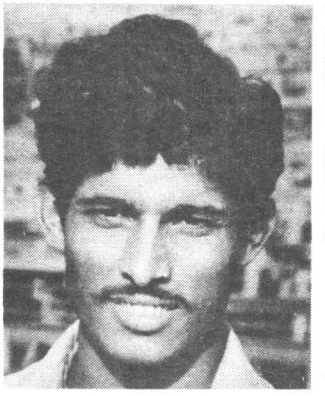

ভাস্কর গাঙ্গুলী

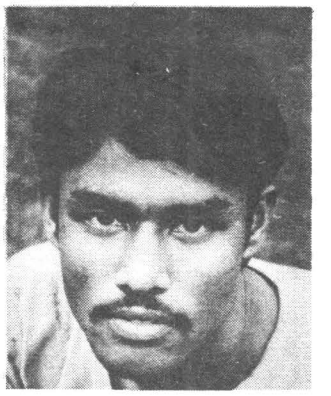

লক্ষ্মণ বেলেল

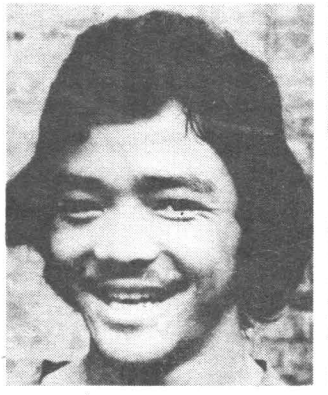

তরুণ মুখিয়া

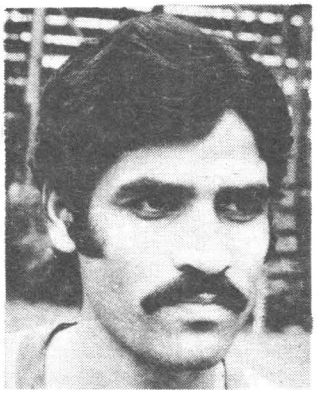

সমীর মুখার্জী

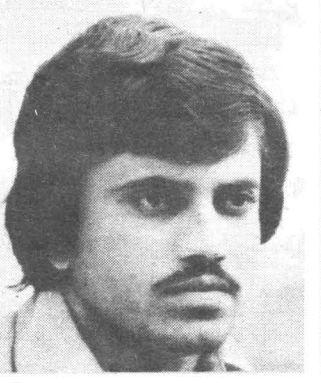

লতিফুদ্দীন

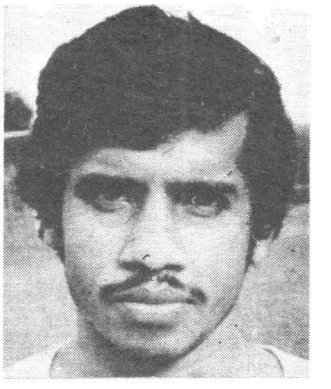

শ্যাম কর্মকার

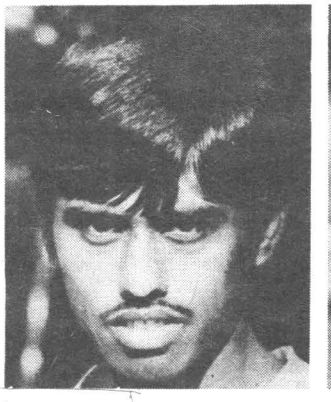

বিদেশ বসু

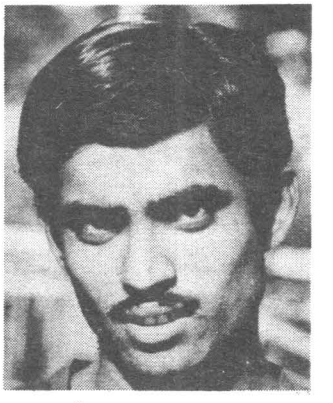

মানস ভট্টাচার্য

## আচ্ছা বলো তো

### তানুমতী

প্রঃ কিসমিস থেকে দুটো হ্রস্ব-ই উড়ে গেলে কী হবে ?
উঃ বিখ্যাত ফুটবল টিম।

প্রঃ কোন ফুটবল খেলতে গেলে মাথা গরম হবেই হবে ?
উঃ রাগবি।

প্রঃ টুটেনখামেন কারো মামা ছিলেন না কেন ?
উঃ কারণ তিনি মামি ছিলেন।

প্রঃ বোধিদ্রুম কী ?
উঃ যে বৃক্ষের তলায় বুদ্ধদেব দ্রুম করে পড়ে যান।

প্রঃ কোন শহর পুড়ছে ?
উঃ বার্নপুর।

প্রঃ কোন অঞ্চলে কাপুরুষ নেই ?
উঃ বীরভূম।

প্রঃ কোন শহরের শেষের অক্ষর বাদ দিলে বুদ্ধি লোপ পায় ?
উঃ বোকারো ।

প্রঃ কে সবাইকে পা ধুতে বলছে ?
উঃ ধোপা।

প্রঃ টুথব্রাশ কেন সব সময়েই মাপ চাইছে ?
উঃ কেননা তাকে দিয়ে রোজ মার্জনা করা হয়।

প্রঃ যে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না তাকে এক কথায় কী বলা উচিত ?
উঃ কুঁড়ে।

প্রঃ যে রাজা কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছেন না তাঁকে এক কথায় কী বলা যায় ?
উঃ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

প্রঃ আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন ? ভদ্রলোক উত্তরে বাংলা মানে করে বললেন, বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডাও বলতে পারো, আবার কাল-কালও বলতে পারো। কী সেই দেশ ?
উঃ চিলি।

**সুলেখা** কলার বক্সের রং দিয়ে ছবিটি রাঙিয়ে তোল

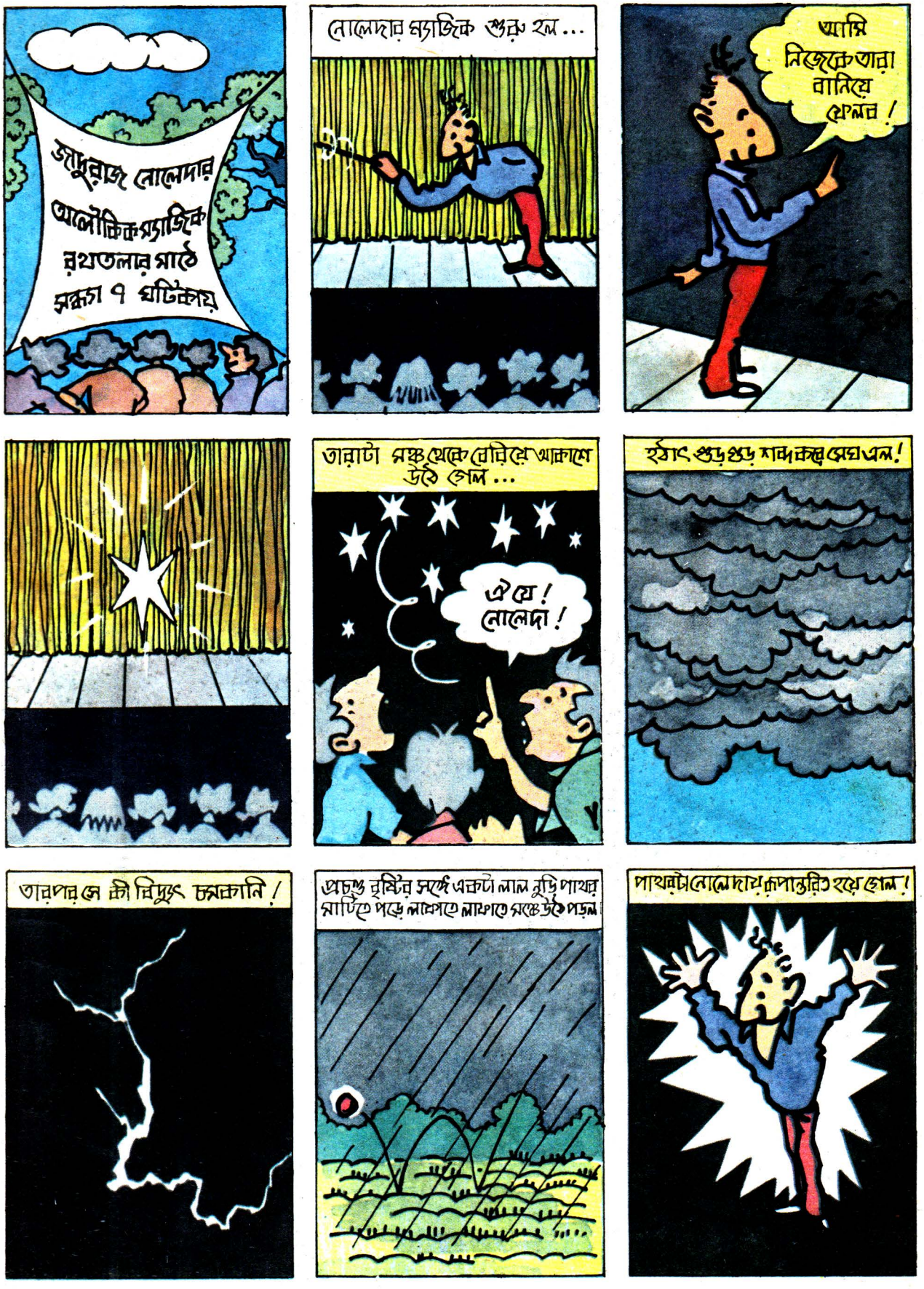

জাদুরাজ নোলেদার
অলৌকিক ম্যাজিক
রথতলার মাঠে
সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়
নোলেদার ম্যাজিক শুরু হল ...
আমি নিজেকে তারা বানিয়ে ফেলব!
তারাটা মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আকাশে উঠে গেল ...
ঐ যে! নোলেদা!
হঠাৎ গুড়গুড় শব্দ করে মেঘ এল!
তারপর সে কী বিদ্যুৎ চমকানি!
প্রচণ্ড বৃষ্টির সঙ্গে একটা লাল নুড়ি পাথর মাটিতে পড়ে লাফাতে লাফাতে মঞ্চে উঠে পড়ল।
পাথরটা নোলেদায় রূপান্তরিত হয়ে গেল!

## আঁকো

### রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

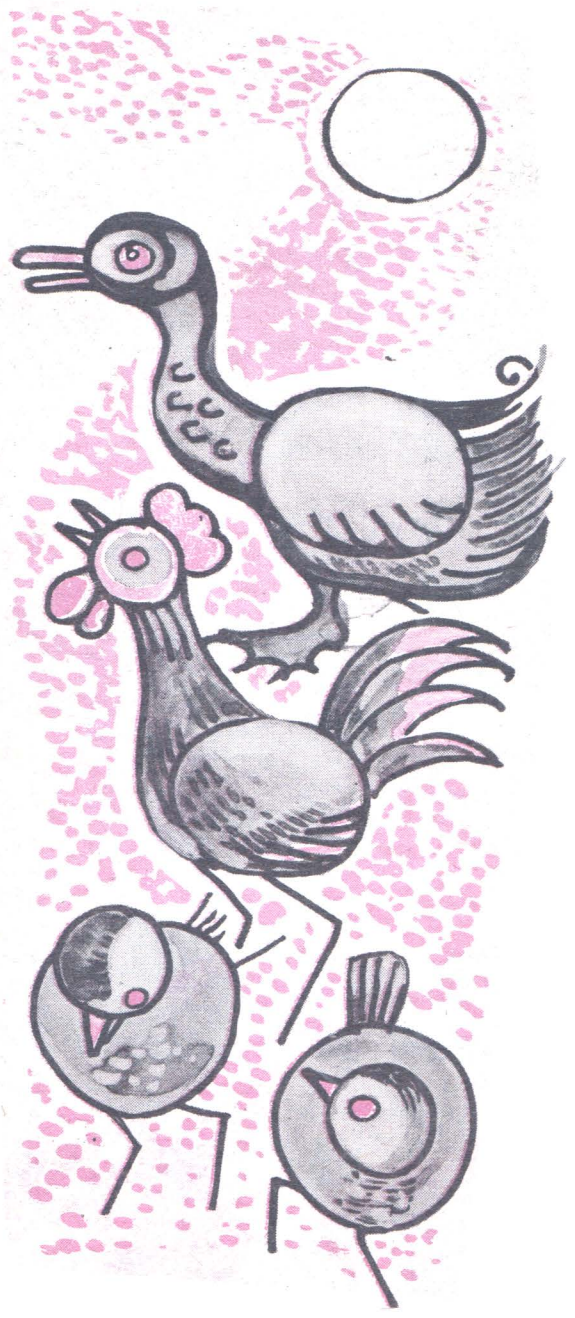

আবার সেই পাখির ছবিই তোমাদের সামনে ধরলাম। পাখিগুলোর দিকে ভালভাবে নজর দিলে বুঝতে পারবে। দুটি গোলের একটু নড়াচড়াতে পাখির বিভিন্ন ভঙ্গি এসে ধরা দিচ্ছে। আবার দুটি গোলের বিশেষ বিশেষ তফাতে কখনো হাঁস, মুরগি, সারস ইত্যাদি সব পাখি যেন আপনা থেকে এসে ধরা দিচ্ছে। বিশেষ বিশেষ পাখির গড়ন ভাবলে দেখবে একই বৃত্তের ওলট-পালটের মধ্যেই সমস্ত পাখির জগৎ লুকিয়ে আছে। তবে "দ" দিয়ে পাখি আঁকার প্রথম পাঠ আমরা সবাই নিয়েছি।

## শেখো

### কারিগর

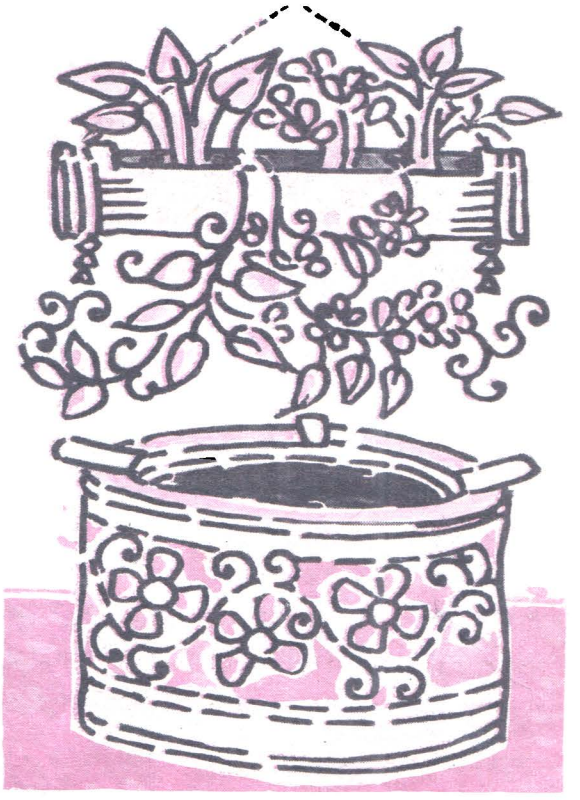

## বাঁশের কাজ ঃ—ফুলদানি ছাইদানি

বাঁশের কাজের শুরু টেবিল ম্যাট আর কোস্টার দিয়ে। এবার ফুলদানি আর ছাইদানি।

জোগাড় করা জিনিসের সঙ্গে যোগ করো বাটালি, অ্যালুমিনিয়ামের ছোট গ্লাস, পুঁথি, ক্রাইলিন রঙ, ভারনিস আর প্যারাফিন। শুরু করো। ফুলদানি ঃ বাড়িতে যে কোনো জায়গায় কোলানো অর্কিড সাজিয়ে রাখতে বাঁশের ফুলদানির তুলনা নেই। লম্বা অনুযায়ী দুটি গাঁটের ফাঁক রেখে কেটে নাও। এবার আড়াআড়ি গাঁটের দুপাশে জায়গা রেখে মাপ মত কেটে ভেতরের ফাঁপা অংশ বার করে তাতে মাটি আর বালি দিয়ে ভরে ইচ্ছে মত গাছ লাগিয়ে দুপাশে তার দিয়ে আটকে ঝুলিয়ে দাও আটচালায়। যেখানে তার লাগাবে তার নীচে পুঁতির ঝুমকো ঝুলিয়ে রঙের বাহার আনো। ইচ্ছে হলে এই ফুলদানিকে ইচ্ছেমত রঙ করতে পার, অবশ্যই ঘরের রঙ বুঝে। ফুলদানির আরও নানান ধরনের কাজ জানতে পারবে পর-পর।

ছাইদানি ঃ যত বড় ছাইদানি করতে চাও, সেই মত বাঁশের গাঁট রেখে ওপরের অংশের ৩"-৪" কেটে নাও। মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে, তার গায়ে তোমার পছন্দ সই নকশা করো ক্রাইলিন রঙ দিয়ে। এবার বাজার থেকে প্রয়োজনমত অ্যালমুনিয়ামের ছোট গ্লাস কিনে ছাইদানের মধ্যে আটকে নাও। সবশেষে সিগারেট রাখার জন্যে পাতলা পাত থেকে নকশা মত কেটে জুড়ে দাও তিন চারটে। পেরেক না লাগিয়ে ফেভিকল দিয়ে জুড়লে বেশ শক্ত হবে। সব কাজের শেষে ভারনিস লাগিয়ে নাও।

জেনে রখো—(১) অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস দেওয়ার কারণ আগুন ধরবে না, আবার জলও ঢালা যাবে।

(২) ক্রাইলিন রঙ ব্যবহারে ধুয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

(৩) ফুলদানির ক্ষেত্রে, আলাদা পাত্রে প্যারাফিন গালিয়ে ফুলদানির মাঝে ঢেলে ঘুরিয়ে নিলেই সারা গায়ে লেগে যাবে। জল পড়ার ভয় থাকবে না।

(৪) বাঁশের চকচকে গা কোনো কিছু দিয়ে পরিষ্কার করতে গেলে চেকনাই চলে যাবে।

‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥’

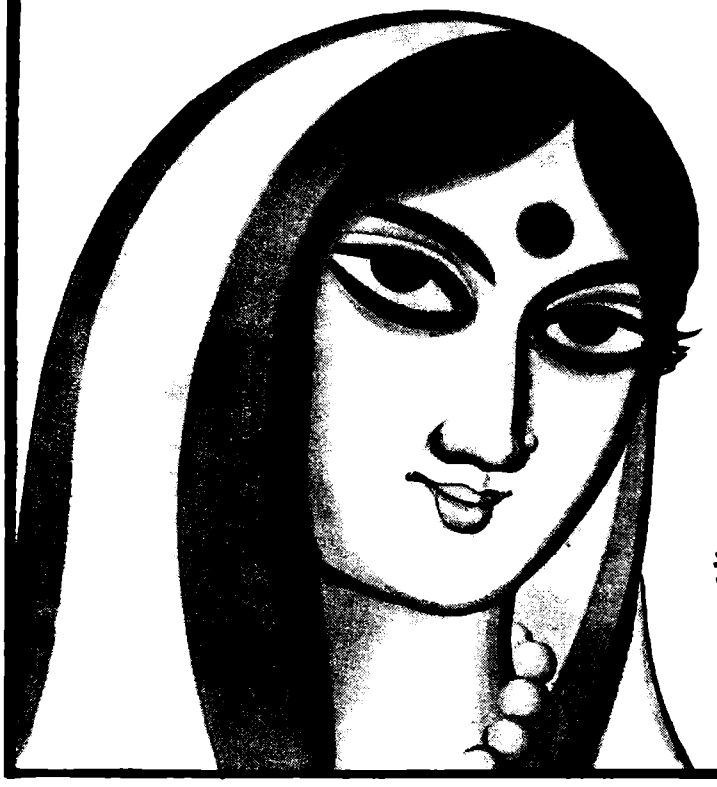

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBIPUB 477

everest/1036/PP-bn